প্রকৃত মুসলিম হতে হলে যা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে!

কালিমাতুশ শাহাদাহ

[ব্যাখ্যাসহ]

সংকলনে

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

সম্পাদনায়

শাইখ মুনীরুল ইসলাম আয-যাকির

কালিমাতুশ শাহাদাহ

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

সম্পাদনা
শাইখ মুনীরুল ইসলাম আয-যাকির

প্রকাশনায়
ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা
১৫৬ লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা- ১১০০।
মোবা:- ০১৮৭৪-৫০০২২২; ০১৯১২-১৭৫৩৯৬

কালিমাতুশ শাহাদাহ

সংকলনে : **গাজী মুহাম্মাদ তানজিল**
Mobile: +880183-8362571
Email: gazimuhammadtanjil@gmail.com

সম্পাদনায় : শাইখ মুনীরুল ইসলাম আয-যাকির

প্রকাশনায় : ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড
প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ: যিলহজ্জ, ১৪৩৬; সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
২য় সংস্করণ: রবিউল আউয়াল, ১৪৩৭; জানুয়ারী, ২০১৬।

প্রাপ্তিস্থান :

ঢাকা : **ইমাম পাবলিকেশন্স শো-রুম**
১৫৬ লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা- ১১০০ সন্ত
(সুরিটোলা জামে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কর্ণারে)।
মোবাইল : ০১৮৭৪-৫০০২২২; ০১৮৭৪-৫০০৩৩৩
তাওহীদ পাবলিকেশন্স : ০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১১ ০-৩৬৮২৭২; ০১ ১৯-৬৫৬৩৯৬।

গাজীপুর : **আন-নূর লাইব্রেরী–** হাজিরপুকুর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
মোবাইল : ০১ ১৯-১ ৮০৫০; ০১৭৮৫-২৩৪৬৬৯।

নারায়ণগঞ্জ: **কাজী লাইব্রেরী–** ছনপাড়া বাজার, পাঁচরুখী, আড়াইহাজার,
মোবা : ০১৭৫১-৮৬৮৬৬২।

রাজশাহী : **ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী–** রাণীবাজার, মোবা : ০১ ২২-৫৮ ৬৪৫।

সিলেট : **সালেহ বুক স্টল–** কুদরত উল্লাহ মার্কেট, মোবা : ০১৭৮৮-৪৮৫৭২৬।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র।

Kalimatush Shahadah
Written by Gazi Muhammad Tanjil, Edited by Shaikh Munirul islam aj-jakir, Published by Imam publications limited. 156, Lutfor rahman lane, Suritola, Dhaka-1100. Price : 60 Tk.
Email : imampublications@gmail.com
Call : +8801874500222, +8801874500333

কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে গেছেন– **আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো** আল্লাহর **কিতাব** (কুরআন)**, আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ** (হাদীস)।

[মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ১৮৭৪, মিশকাত ১৮৬, সিলসিলা সহীহাহ ১৭৬১]

আমার,
শ্রদ্ধেয়/স্নেহের...
....
....কে
'কালিমাতুশ শাহাদাহ' বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

....
....
স্বাক্ষর

....
তারিখ
....

- যারা এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান।
- যারা জান্নাতের পথকে সুগম করতে চান।
- যারা সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জনে আপোষহীন।
- যারা হক (সত্য) জানতে আগ্রহী।

তাদের জন্য এ বইটি একটি সামান্য উপহার।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও দাঈ
শাইখ মুরাদ বিন আমজাদ এর অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

এটি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর রচিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। কুরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার আলোকে রচিত যুগোপযোগী একটি বই। লেখক এবং সম্পাদক উভয়ই আমার স্নেহভাজন। হাজারও ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটির সিংহভাগই দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। বইটিতে **শাহাদাতাইন বা সাক্ষ্যদানের দুটি** বাক্য নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করি, সচেতন পাঠকগণ এতে সহীহ আকীদা-মানহাজের প্রচুর খোরাক খুঁজে পাবেন। দু'আ করি, লেখক-সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ ﷻ উত্তম জাযা দান করুন এবং পাঠকদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন। আমীন।

শাঈখ মুরাদ বিন আমজাদ
০১ যিলহজ্জ, ১৪৩৬ হিজরি।
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মুসলিম উম্মাহ ফাউন্ডেশন- বাংলাদেশ।
www.muslimummahfoundation.com

বিশিষ্ট কুরআন গবেষক, লেখক ও দাঈ
শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী এর অভিমত

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত শাশ্বত জীবনবিধান। এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম পরিচয়ে বসবাস করলেও ইসলামের প্রকৃত কল্যাণ থেকে আমরা বঞ্চিত। এর কারণ হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং ইসলামের বিধিবিধান না মানা। এমনকি যে কালিমা পড়ে আমরা মুসলিম হয়েছি, সে কালিমার তাৎপর্য কী, কালিমা আমার কাছে কী চায়, কালিমা পড়ার কারণে আমার উপর কী কী কাজ আবশ্যক হয় এবং কোন্ কোন্ কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়– এসব মৌলিক বিষয় অনেকেরই জানা নেই। এসব বিষয় নিয়েই **গাজী মুহাম্মাদ তানজিল** ভাই সংক্ষিপ্তভাবে সাজিয়েছেন বইটি। আশা করা যায় এর মাধ্যমে সত্যসন্ধানীরা তাওহীদের দিশা খুঁজে পাবে। আমি বইটির সফলতা কামনা করছি এবং সংকলকের জন্য মহান রবের কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী
আরবি প্রভাষক :
আলহাজ্জ মোহাম্মদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা
খতীব :
হাজিরপুকুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
১৬/ ০৯/ ২০১৫ ইং; ০২ যিলহজ্জ, ১৪৩৬ হিজরি।

Contents

সূচীপত্র

সম্পাদকের কলাম...

গাজী ভাইয়ের সাথে পরিচয় লাইট হাউজ[১] থেকে। অনিয়মিত হলেও লিখতাম। তিনি লিখতেন নিয়মিত। পড়তাম। আমি তার লেখার খুব ঘনিষ্ঠ একজন পাঠক। **কালিমাতুশ শাহাদাহ** লিখছিলেন তখন। অপেক্ষার প্রহর গুণতাম প্রতিদিন নতুন পর্বের জন্য। PDF পড়লাম নেটে। আপলোডের পর মাত্র ক'দিনে ডাউনলোড হয়েছে ২০০০ বারেরও বেশি। সবার মুখে মুখে, ব্লগে, স্যোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার ঝড়। তারপর একদিন শুনলাম– বাজারে ছাড়তে চাচ্ছেন। আর্থিক ব্যাপার-স্যাপার আছে। প্রয়োজন ভাল একজন আলেমকে দেখানোর। ভাষাগত দুর্বোধ্যতাও আছে অকিঞ্চিৎ। যাক! এরপর কথা হলো, দেখা হলো, আলোচনা পরামর্শ হলো। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সব দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলাম। শুরু করে দিলাম কাজ। দিন-রাত অবিরাম। সাথে ছিল ভাইদের অনুপ্রেরণা। প্রতিটা বিষয়কে সহজ ও আরো সংক্ষেপ করা হলো। সংযোজন করতে হলো প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়।

আর হ্যাঁ, **'কালিমাতুশ শাহাদাহ'** বইটি আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যয় হয়েছে যেসব দুনিয়া বিমুখ ও আখিরাতমুখী মুওয়াহহিদ ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রম, পরামর্শ আর সার্বিক সহযোগিতা– শেষ-রাতের অশ্রুবিগলিত মুনাজাতে স্মরণে থাকে যেন তাদের কথা।

শাইখ মুনীরুল ইসলাম আয-যাকির
০১ যিলহজ্জ, ১৪৩৬ হিজরি।
ibnujakir1@gmail.com
+8801828616067

বইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্মান-সূচক বাক্যের সংক্ষিপ্ত আরবি ও বাংলা রূপ।

যার নামের পর	**যা বলতে হয়** (সম্পূর্ণ বাক্য)	**সংক্ষিপ্ত রূপ**
আল্লাহর	সুবহানাহু ওয়া তা'আলা (তিনি মহান ও পবিত্র)	سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
নবী মুহাম্মাদ এর	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তার উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)	ﷺ
সকল নবীদের	আলাইহিস সালাম (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)	عَلَيْهِ السَّلَامُ
সাহাবীর	রাযিআল্লাহু আনহু (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোক)	رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
পূর্ববর্তী সৎলোকদের	রহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তাদের উপর রহমত করুন)	রহ.

১ http://lighthouse24.org

*** আমার কিছু কথা ***

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর। অতঃপর– কালিমা সম্পর্কে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। অধিকাংশ মানুষ এ **'কালিমাতুশ শাহাদাহ'** বা **সাক্ষ্যদানের বাক্য** সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র আল্লাহ ﷻ যার প্রতি করুণা করেছেন, আর শিরক থেকে রক্ষা করেছেন, সে ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই তাদের অজান্তেই শিরক নামক মহামারিতে আক্রান্ত হচ্ছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে– তারা জানে না এ কালিমার অর্থ কী, কী এর গুরুত্ব ও মর্যাদা। জানে না কালিমার দাবিই বা কী। এ কালিমার সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে কী তারা স্বীকার করে নিচ্ছে, আর কী অস্বীকার করছে। দাবি করছে আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য করো ইবাদাত করি না। অথচ বাস্তবিকভাবে তারা আল্লাহর পাশাপাশি আরো বহু রবের/ইলাহের ইবাদাত করছে। এভাবে তারা শিরকের স্রোতে ঈমানকে বিলিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন, ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে । [সূরা ইউসুফ ১২: ১০৬]

অধিকাংশ মুসলিমই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কালিমা মুখে উচ্চারণ করলে অথবা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করলে বা লালিত পালিত হলে কিংবা সুন্দর একটা আরবি নামধারণ করলেই মুসলিম হওয়া যায়। তার কাজ-কর্ম জীবনযাপন পদ্ধতি যাই হোক না কেন। অথচ সাহাবীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের এবং আমাদের কালিমা বুঝার ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পতাকাতলে নিজেকে দাখিলের জন্য প্রত্যেকেরই কালিমাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে তাওহীদ ও রিসালাতের এ কালিমাকে সহজভাবে বুঝতে পারে তাই এই ছোট বইটির সংকলনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। একজন সচেতন ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে আপনি আপনার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ঈমাম/খতিব, দাঈ, অফিসের কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষকে কালিমার **প্রকৃত মর্ম** বুঝানোর জন্য এই **বইটি বিনামূল্যে বিতরণের** মাধ্যমে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি **অর্জন** করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। বইটি বিনামূল্যে বিতরণের প্রয়োজন হলে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নিচে উল্লেখিত **মোবাইল নং** এ বা **ইমেইলে**। প্রয়োজনে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় বই পাঠানোর ব্যবস্থা করব ইনশা-আল্লাহ। বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে খরচ পড়বে প্রতি কপির জন্য ২৫ টাকা হারে।

- ১০০ কপির জন্য = ২,৫০০ টাকা।
- ৫০০ কপির জন্য = ১২,৫০০ টাকা।
- ১০০০ কপির জন্য = ২৫,০০০ টাকা।

প্রিয় দ্বীনি মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা নবী-রাসূলগণের সেই তাওহীদি মিশনকে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হই। বই বিতরণে অংশগ্রহণ করলে এটাও আপনার-আমার জন্য একটা সাদাকায়ে জারিয়ারূপে গণ্য হবে। এর সওয়াব আপনার মৃত্যুর পরও জারি থাকবে– যতদিন মানুষ উপকৃত হবে এই বই পড়ে। তাই এই ক্ষণকালীন পৃথিবীতে আমাদের কিছু পদচিহ্ন রেখে যাওয়া উচিত। হয়তো পরকালে এটাই আপনার-আমার জন্য নাজাতের ওসীলা হতে পারে। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, সুতরাং ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে বা কোন পরামর্শ থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুল করবেন না। পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ। আর বইটি প্রকাশ করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিদান কেবল আরশের অধিপতিই দিতে পারেন; তিনিই উত্তম প্রতিদানদাতা। আল্লাহ ﷻ আমার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং এই নগণ্য বান্দার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

তাং- ০৫.০১. ১৬ ইং

Mobile-: +880183-8362571

Email: gazimuhammadtanjil@gmail.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের কতিপয় মৌলিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ আমাদের রব কে?

উত্তরঃ আমাদের রব আল্লাহ ﷻ। যিনি গোটা সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন– ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। [সূরা ফাতিহা ১: ১]

প্রশ্ন-২ রব কাকে বলে?

উত্তরঃ কুরআনে রব শব্দটি এসেছে ৯৮০ বার। রব এমন একটি আরবি শব্দ যা অন্য ভাষায় এক শব্দে যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব নয়। সাধারণত রব এর অর্থ করা হয় প্রতিপালক, কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয় না। রব হচ্ছেন ঐ সত্তা– যিনি গোটা সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, বিধানদাতা ও ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার।

প্রশ্ন-৩ আমরা আমাদের রবকে কীভাবে চিনব?

উত্তরঃ রবের নিদর্শন যেমন রাত, দিন, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, সাগর, ঝর্ণা, নদী এবং ভূমন্ডল-নভোমন্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমরা তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَمِنْ اٰيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ﴾

তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে হলো রাত, দিন, সূর্য আর চন্দ্র। সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না। সেজদা করো আল্লাহকে যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যদি সত্যিকারভাবে তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে চাও। [সূরা হামীম সাজদা ৪১: ৩৭]

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ﴾

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই অনুগত। জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। [সূরা আরাফ ৭: ৫৪]

প্রশ্ন-৪ আমাদের রব কোথায় আছেন?

উত্তরঃ আমাদের রব আরশে আযীমে আছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

﴿اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰی﴾

দয়াময় আরশে সমুন্নত আছেন। [সূরা ত্বহা ২০: ৫]

প্রশ্ন-৫ আল্লাহ কি সবখানে বিরাজমান?

উত্তরঃ না, সত্তাগতভাবে তিনি সবখানে বিরাজমান নন বরং তার জ্ঞান গোটা বিশ্বকে ঘিরে আছে। সবকিছুই তার দৃষ্টির সামনে। তার জ্ঞানের বাইরে এই মহাবিশ্বের কিছুই নেই। সবখানে তাঁর রহমত, বরকত, দয়া, কল্যাণ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। তিনি সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে সমুন্নত।[২]

﴿اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یُّرۡسِلَ عَلَیۡکُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ کَیۡفَ نَذِیۡرِ﴾

কিংবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না? যাতে তোমরা জানতে পারবে যে, কেমন (ভয়ানক) ছিল আমার সতর্কবাণী। [সূরা মুলক ৬৭: ১৭]

﴿اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَسَخَّرَ الشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّکُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ﴾

আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলীকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন, যা তোমরা দেখছ, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের বন্ধনে বশীভূত রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গতিশীল আছে। যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পার। [সূরা রাদ ১৩: ২]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهٗ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهٗ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং ঘোষণা করতে থাকেন, কে আমাকে ডাকছ, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে প্রার্থনা করছ, আমি তাকে দান করব। কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।[৩]

---

[২] এ আয়াতে আল্লাহর একটি ক্রিয়াবাচক গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে استواء (ইসতাওয়া) বা আরশের উপর উঠা। ইমাম মালেককে এ গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, استواء (ইসতাওয়া) এর অর্থ জানা আছে। তবে তার ধরন (كيفية) জানা নেই। এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ওয়াজিব এবং এর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদআত। এ নীতিটি আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[৩] সহীহ বুখারী -১১৪৫, সহীহ মুসলিম -৭৫৮ ।

প্রশ্ন-৬ আমাদের দ্বীন কী?

উত্তর: আমাদের **দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা** হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম অর্থ একমাত্র আল্লাহর নিকট আনুগত্য/আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা।

আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। [সূরা আল-ইমরান ৩: ১৯]

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আল-ইমরান ৩: ৮৫]

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম। [সূরা মায়েদা ৫: ৩]

প্রশ্ন-৭ আমাদের নবী কে?

উত্তর: আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি সর্বশেষ রাসূল। তাঁর সুন্নাহ ব্যতীত কোন ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর আদর্শেই রয়েছে মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি।

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। [সূরা আহযাব ৩৩: ২১]

প্রশ্ন-৮ ইসলাম কী?

উত্তর: ইসলাম একটি আরবি শব্দ। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– অনুগত হওয়া, নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। পারিভাষিক অর্থে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের নাম, যা মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা, আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর অনুসরণ করা। শিরক থেকে পবিত্র হওয়া এবং মুশরিকদের থেকে মুক্ত হওয়া।[৪]

প্রশ্ন-৯ ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ কী?

উত্তর: ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে ইসলামকে নিজের দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং আমরণ ইসলামের উপর টিকে থাকা।

---

[৪] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ১/১২৯।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

হে মুমিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সূরা বাকারা ২: ২০৮]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আল-ইমরান ৩: ১০২]

প্রশ্ন-১০ ইসলামের মূল উৎস কী?

উত্তর: ইসলামের মূল উৎস দু'টি। কিতাবুল্লাহ তথা আল-কুরআন ও সুন্নাতে নববী তথা সহীহ হাদীস। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে গেছেন–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় (দুটি জিনিস) রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ (আদর্শ)।[৫]

প্রশ্ন-১১ ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। হাদীসে এসেছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এর ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা এবং রমাযানের সিয়াম পালন করা।[৬]

প্রশ্ন-১২ মুসলিম কে?

উত্তর: আল্লাহর কাছে যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়, আত্মসমর্পণ করে, আনুগত্য করে, এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদাত করে, সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত হয়, শিরককারীদের থেকে মুক্ত হয় এবং তার জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মেনে নেয়, প্রকৃতপক্ষে সে-ই মুসলিম।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "সুতরাং ইসলাম মানে- একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে নয়। শুধু তাঁরই ইবাদাত করা, কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করা। তাঁর প্রতি নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া। তার কাছে আশা করা এবং তাকেই একমাত্র ভয় করা। সৃষ্টির কাউকে

---

[৫] মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৩, ৩৩৩৮, ১৮৭৪; মিশকাত ১৮৬; সিলসিলা সহীহাহ ১৭৬১।

[৬] সহীহ বুখারী ৮; সহীহ মুসলিম ১৬; সুনানে তিরমিযি ২৬০৯।

তাঁর মতো এমন ভাল না বাসা। সুতরাং এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে যে অপছন্দ করে সে মুসলিম নয় এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করে বা পাশাপাশি করে তাহলে সেও মুসলিম নয়।[৭]

প্রশ্ন-১৩ মুমিন কে?

উত্তর: কুরআন ও সহীহ হাদীসে উলেণ্টখিত ছয়টি রুকন এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের প্রতি যে যথার্থ ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তাকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলা হয়। প্রকৃত মুমিনদের পরিচয়ে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ﴾

মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী। [সূরা হুজুরাত ৪৯: ১৫]

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ - أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾

নিশ্চয় মুমিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে, এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। [সূরা আনফাল ৮: ২-৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হব।[৮]

প্রশ্ন-১৪ ইবাদাত কাকে বলে?

উত্তর: ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, দাসত্ব করা, নত হওয়া, অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থে ইবাদাত হচ্ছে ঐ সকল কাজ– যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও খুশি হন। তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, কথায় কিংবা কাজে।

---

[৭] কিতাবুন নবুওয়াত, পৃ: ১২৭।

[৮] সহীহ বুখারী ১৫; সহীহ মুসলিম ৪৪; ইবনে মাজাহ ৬৭।

অন্যভাবে বলতে গেলে ইবাদাত হচ্ছে ঐ বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম যা আল্লাহ ﷻ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। এছাড়াও কোন কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় তাও ইবাদাত। ইবাদাত বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। যেমন-

১. আন্তরিক ইবাদাত। যেমন– ঈমানের ছয়টি রুকন, ভয়, আশা, ভরসা, আগ্রহ ও ভীতি ইত্যাদি।
২. প্রকাশ্য ইবাদাত। যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৫ কাফের কাকে বলে?

উত্তরঃ কাফের [كافر - Kafir] একটি আরবি শব্দ, যা আরবি কুফর [كفر -Kufr] ধাতু থেকে আগত, যার শাব্দিক অর্থ হলো– ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা এবং এর ব্যবহারিক অর্থ হলো অবাধ্যতা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা। এটি ইসলামী তথ্যলিপিসমূহে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। সাধারণত **'অবিশ্বাসী'** হিসেবে একে অনুবাদ করা হয়। যে ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তাকে কাফের বলে। বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ বহন করছে। কাফের ব্যক্তি এ মহাসত্যকে দেখেও গোপন করে, অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে। মানুষ সব সময় আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। আগুন, পানি, আলো, বাতাস সবকিছুই আল্লাহর দান। মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, মস্তিষ্ক, জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ সবই আল্লাহর দান। এরপরও যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও তাঁর দ্বীন ইসলামকে অস্বীকার করে সে চরম অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও কাফের।

প্রশ্ন-১৬ মুশরিক কে?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর একক ক্ষমতা বা গুণাবলির ক্ষেত্রে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে সে মুশরিক। অর্থাৎ যে আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদাত করল, অন্য কারও জন্য কুরবানী, মান্নত, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন করল সে মুশরিক। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বাদ দিয়ে অন্য কারও বা অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টির জন্য কোন ইবাদাত করলেও সে মুশরিক।

প্রশ্ন-১৭ গণতন্ত্র কী?

উত্তরঃ গণতন্ত্র শব্দটি গ্রীক শব্দ Demos [ডেমোস] থেকে উৎপন্ন। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy [ডেমোক্রেসি]। পারিভাষিক অর্থে গণতন্ত্র বলা হয় জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা তাদের চাহিদার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা। গণতন্ত্র বলতে বুঝায়– Government of the people, for the People, by the People. অর্থাৎ জনগণের সরকার, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা। গণতন্ত্রে জনগণ নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতার বলে আইন রচনা করে। এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। অর্থাৎ নিজেরাই আইন তৈরি করে রবের আসনে বসে যায়। যেটা কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তারই কাজ।

প্রশ্ন-১৮ গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: গণতন্ত্র ও ইসলাম– দুটি বিপরীতমুখী এবং সাংঘর্ষিক **দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা**। **প্রথমটি** মানবরচিত আর **দ্বিতীয়টি** আল্লাহ প্রদত্ত। সুতরাং আল্লাহ যেমন নিষ্কলুষ তাঁর দ্বীনও তেমনি নিষ্কলুষ; আর মানুষ যেমন কলুষতায় পূর্ণ তেমনি মানবরচিত দ্বীনও ভুল-ভ্রান্তি ও কলুষতায় পূর্ণ। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আল-ইমরান ৩: ৮৫]

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। [সূরা আল-ইমরান ৩: ১৯]

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। [সূরা বাকারা ২: ২০]

পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে– “জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী।” এটা একটা শিরকী কথা। ইসলামের মূল ভিত্তিই হচ্ছে তাওহীদ। এখানে আল্লাহর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। অথচ গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। ইসলামে আইনের উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আর গণতন্ত্রে আইনের উৎস মানুষের খেয়াল-খুশি। আল্লাহ বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾

তুমি কি তাকে দেখ না যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে? [সূরা ফুরকান ২৫: ৪৩]

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾

আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন? [সূরা তীন ৯৫: ৮]

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

তারা কি জাহেলী যুগের আইন বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ? [সূরা মায়েদা ৫: ৫০]

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না, এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। [সূরা ইউসুফ ১২: ৪০]

পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পার্লামেন্টে বসে এম.পি সাহেবরা যেমন ইচ্ছা আইন বানাতে পারে। জনগণই এ ব্যবস্থার বিধান প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারো কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই জনগণই এ ব্যবস্থার **রব/ইলাহ**। আর আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে এটা স্পষ্ট শিরক। তাই কুফরী এই গণতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন-১৯ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ কী?

উত্তরঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে ইংরেজিতে Secularism [সেক্যুলারিজম] বলা হয়। Encyclopedia of Britannica-তে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from the worldliness to life on earth. অর্থাৎ এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখিরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়।[৯] ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর মূল কথা হলো– Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. অর্থাৎ ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র। ড. আলী জারীশা বলেন, اَلْعَلْمَانِيَّةُ هُوَ فَصْلُ الدِّيْنِ عَنِ الدَّوْلَةِ রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।[১০] এক কথায় বলা যায় যে, মানবজীবনের পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি থেকে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে মসজিদ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীন জীবন গঠনের মাধ্যম মন্ত্রই হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

পর্যালোচনা : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। **এক :** ধর্মবিমুখতা। মানুষ এখানে তার বিবেকের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। **দুই :** দুনিয়াপূজা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের **মূল রূহ** হলো **'দুনিয়া'**। এখানে ধর্মীয় কোন কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই। যেনতেন প্রকারে দুনিয়া হাসিল হলেই যথেষ্ট। এজন্যই তারা **জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস** বলে মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রে আল্লাহর আইনের কোন প্রবেশাধিকারকে তারা তোয়াক্কা করে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক অতি প্রাচীন এই মতবাদের মাধ্যমে আর যাই হোক ইসলামী খেলাফত/ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। সর্বক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রচলনের ফলে মুসলিমরাও এখন ইসলামকে অপূর্ণ ভাবতে শুরু করেছে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল– আপনারা এই কুফর থেকে দূরে থাকুন।

প্রশ্ন-২০ মুরতাদ কাকে বলে?

উত্তরঃ মুরতাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– বিমুখ হয়েছে বা ফিরে গেছে এমন বা ইসলামচ্যুত বা ধর্ম ত্যাগ করা। এর মূল মর্ম হলো– ইসলাম ত্যাগ করা বা ইসলামের কোন মৌলিক আকীদা বা বিধানকে মানতে অস্বীকার করা, কিংবা তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা অথবা ইসলামের কোন নিদর্শনকে অবমাননা/ঘৃণা/ঠাট্টা/বর্জন করা, যা অন্তরের ভক্তিশূন্যতা ও শ্রদ্ধাহীনতার আলামত বহন করে। আর এ ধরনের কাজ যে করে তাকেই কুরআন-সুন্নাহ এর দলীলের ভিত্তিতে মুরতাদ বা ইসলামচ্যুত বলে।

---

[৯] Encyclopedia of Britannica, 15th Edn. 2002.Vol-X. P. 594.

[১০] আল-ইত্তিজা-হাতুল ফিকরিইয়াহ আল-মুয়াসারাহ, পৃ. ৮৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কালিমাতুশ শাহাদাহ

অভিধান [Dictionary] প্রণেতাদের মতে কালিমা শব্দটির শাব্দিক অর্থ– অর্থবিশিষ্ট একক শব্দ। আবার এটি একটি সার্থক বাক্যকেও বুঝায়। কুরআন ও হাদীসে ঈমান বা বিশ্বাসের মূল হিসেবে **দুইটি সাক্ষ্য** প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশে **'কালিমা শাহাদাত'** হিসেবে পরিচিত, একে **শাহাদাতাইন বা দুটি সাক্ষ্যও** বলা যায়। কোন অমুসলিম যদি মুসলিম হতে চায় তাকে এই কালিমার পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য দিয়ে এর শর্ত ও দাবিসমূহ মানতে হবে। তবেই কেবল মুসলিম হওয়া যাবে। এই কালিমায় আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাত এর সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

কালিমাতুশ শাহাদাহ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ: আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ **ছাড়া কোন** (সত্য) **ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ** ﷺ আল্লাহর **বান্দা ও রাসূল**।[১]

শাব্দিক অর্থ :

أَشْهَدُ [আশহাদু] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, لَا [লা] নেই, إِلٰهَ [ইলাহ] কোন ইলাহা/মাবুদ/উপাস্য إِلَّا [ইল্লা] ব্যতীত/ছাড়া, اللهُ [আল্লাহ] আল্লাহ, وَ [ওয়া] এবং, أَشْهَدُ [আশহাদু] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, أَنَّ [আন্না] যে/নিশ্চয়, مُحَمَّدًا [মুহাম্মাদান] মুহাম্মাদ ﷺ, عَبْدُهٗ ['আবদুহূ] তাঁর গোলাম বা দাস/বান্দা, وَ [ওয়া] এবং رَسُوْلُهٗ [রাসূলুহূ] তাঁর রাসূল।

এই কালিমা দুটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথম বাক্য:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

[আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই]।

দ্বিতীয় বাক্য:

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।

[এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল]।

আমরা পর্যায়ক্রমে এ কালিমার দুটি অংশেরই বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ। প্রথমে আমরা প্রথম বাক্যটি নিয়ে আলোচনা করব।

---

[১] সহীহ বুখারী ৮৩১, সহীহ মুসলিম ২৩৪, ৪০২; আবু দাউদ ৯৬৭।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর ব্যাখ্যা

[**আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,** আল্লাহ **ছাড়া কোন** (সত্য) **ইলাহ নেই**]

- لَا إِلٰهَ **[লা-ইলাহা]** মানে সকল বাতিল ইলাহকে বর্জন, আর
  إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] মানে শুধুমাত্র এক ইলাহ তথা আল্লাহকেই গ্রহণ।
- لَا إِلٰهَ **[লা-ইলাহা]** মানে সকল গাইরুল্লাহ[১২] থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আর
  إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] মানে শুধুমাত্র এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

لَا إِلٰهَ إِلَّا الله [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর দুটি অংশ :

এই তাওহীদি কালিমার দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি না-বাচক, আর দ্বিতীয় অংশটি হ্যাঁ-বাচক। প্রথমটি **বর্জনমূলক**, দ্বিতীয়টি **গ্রহণমূলক**।

[না] নেতি বাচক অংশ হলোঃ

لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] বা না-বাচক অংশের মর্ম হলো এই যে, কোন ইবাদাতই কারো জন্য করা চলবে না, কারো সার্বভৌমত্ব ও শক্তি স্বীকার করা চলবে না, কারো বিধান ও আইন-কানুন মানা চলবে না, কোন কিছুতেই কারো প্রভুত্ব স্বীকার করা চলবে না। এসবের কোন একটিতেও কারো বিন্দুমাত্র শরীক স্থাপন করা চলবে না।

[হ্যাঁ] ইতি বাচক অংশ হলোঃ

আর إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] বা হ্যাঁ-বাচক অংশের মর্ম হলো এই যে, শুধুমাত্র আল্লাহই সকল প্রকার ইবাদাতের প্রকৃত হকদার। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তারই বিধান ও আইন-কানুন বান্দার উপর প্রযোজ্য ও প্রয়োগ হবে। সবকিছুতেই তার প্রভুত্ব রয়েছে এবং এ সমস্ত ব্যাপারে কেউ বিন্দুমাত্র তাঁর শরীক নেই। না কোন মালাইকা (ফেরেশতা), না কোন নবী বা কোন ওলী, না কোন জিন-শয়তান, না কোন জড়বৃক্ষ, না কোন মূর্তি, না কোন কবর মাযারের ওলী-দরবেশ ও পীর-ফকীর। যে ব্যক্তি কালিমার এই দুটি রুকনের অর্থ ও মর্ম ভালোভাবে বুঝে মেনে চলতে পারবে তার জন্য এই কালিমার ফযীলত ও উপকার লাভ করা সম্ভব, নচেৎ নয়।[১৩]

---

[১২] আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি বা শক্তির ইবাদাত/উপাসনা-আনুগত্য অথবা বিধান মানা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে– তাকে গাইরুল্লাহ বলে।

[১৩] কালিমার মর্মকথা, আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, পৃষ্ঠা-৫০।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

এর প্রথম অংশ لَا إِلٰهَ লা-ইলাহা যা বর্জনীয়

কালিমাতুত তাওহীদ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ**] এর প্রথম অংশ لَا إِلٰهَ [**লা-ইলাহা**] এর দাবি হচ্ছে নিম্নে বর্ণিত চারটি বিষয় প্রথমে বর্জন করা। যথা:

১. اِجْتِنَابُ الْأَرْبَابِ [ইজতিনাবুল আরবাব] অসংখ্য রবদের বর্জন করা।

২. اِجْتِنَابُ الْأَنْدَادِ [ইজতিনাবুল আনদাদ] সকল প্রকার সমকক্ষদের বর্জন করা।

৩. اِجْتِنَابُ الْأٰلِهَةِ [ইজতিনাবুল আলিহাহ] সমস্ত বাতিল ইলাহদের বর্জন করা।

৪. اِجْتِنَابُ الطَّوَاغِيْتِ [ইজতিনাবুত তাওয়াগীত] সকল প্রকার তাগূতকে বর্জন করা।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটিই ইলাহ বা মাবুদের আসন দখল করে আছে। এজন্য আল্লাহ বলেন, لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] অর্থাৎ এদের সকলকেই প্রথমে বর্জন করো।[১৪]

لَا إِلٰهَ লা-ইলাহা এর এক নম্বর বর্জনীয় বিষয়

اِجْتِنَابُ الْأَرْبَابِ[ইজতিনাবুল আরবাব] **অসংখ্য রবদের বর্জন করা :**

أَرْبَابًا আরবাব অর্থ বহু রব। মুশরিকরা আলেম, দরবেশ এবং তাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিদেরকে রব বানিয়েছিল। তারা ছিল তাদের ধর্মগুরু। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ﴾

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম আর দরবেশদেরকে[১৫] রব বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা তাওবা ৯: ৩১]

এর কারণ হচ্ছে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের আলেম ও ধর্মযাজকরা (দরবেশরা) তাদের জন্য বিধান তৈরি করত এবং কোন্‌টি বৈধ, কোন্‌টি অবৈধ তা নির্ধারণ করত, আর তারাও তা মেনে নিতো। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَفِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ﴾ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ. قَالَ : اَجَلْ وَلٰكِنْ يُحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهُ وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا اَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ

---

[১৪] মূল: লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর শর্ত: প্রথম বর্জন- পরে গ্রহণ পৃ: ২৮-আমিমুল ইসলাম। (ঈষৎ পরিমার্জিত) বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ রইল।-**সংকলক**।

[১৫] এ খানে أحبار (আহবার) দ্বারা ইয়াহূদিদের ধর্মপন্ডিত আর رهبان (রুহবান) দ্বারা নাসারাদের ধর্মপন্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আদী ইবনে হাতেম ﷛ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলাম। তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ছিল। ঐ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআনের এ বাণী পাঠ করতে শুনলাম–"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা (ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা) তো আলেম আর দরবেশদের ইবাদাত করে না। তাহলে তাদেরকে রব বানাল কী করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবশ্যই! কেননা তারা যখন আল্লাহর হারামকৃত কোন কিছুকে হালাল করে দেয় তখন লোকেরা সেটাকে হালাল হিসেবে মেনে নেয়। আবার তারা যদি আল্লাহর হালালকৃত কোন কিছুকে হারাম করে দেয় তখন তারা ওটাকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত।[১৬]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

﴿اِتَّبِعُوا مَآ أُنۡزِلَ إِلَيۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنۡ دُوۡنِهٖٓ أَوۡلِيَآءَ ۗ قَلِيۡلًا مَّا تَذَكَّرُوۡنَ﴾

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মান্য করে চলো, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করো না, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূরা আল-আরাফ ৭: ৩]

এ আয়াতেও বুঝা যায় তাদের ওলী-আউলিয়াগণকে (নেকবান্দাদেরকে) তারা রব বানিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় বাদ দিয়ে পীর-ওলীদের বিনা দলীলে অন্ধ অনুকরণ করলে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয় এবং তাদেরকেই যেন রব মানা হয়।

ফেরাউন নিজেকে রব দাবি করেছিল, ﴿فَحَشَرَ فَنَادٰى - فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الۡأَعۡلٰى﴾

সে লোকদেরকে একত্রিত করল আর ঘোষণা দিল। সে বলল, আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব। [সূরা নাযিআত ৭৯: ২৩-২৪]

এই আয়াতে ফেরাউন যে রব দাবি করেছিল সেটা **আইন তৈরি বা সার্বভৌমত্বের রব**, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে রব নয়। সে দ্বীনের বিধিবিধানের এবং আইন তৈরির ক্ষেত্রে রব দাবি করেছিল। জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়–

﴿وَنَادٰى فِرۡعَوۡنُ فِيۡ قَوۡمِهٖ قَالَ يَا قَوۡمِ أَلَيۡسَ لِيۡ مُلۡكُ مِصۡرَ﴾

ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মাঝে ঘোষণা দিল। বলল- হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? [সূরা যুখরুফ ৪৩: ৫১]

বর্তমান সমাজে একদিকে একশ্রেণির মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রীয় নেতারা আল্লাহর অবতীর্ণ ওহীর বিধান ছেড়ে মানবরচিত বিধানানুযায়ী বিচার-ফায়সালা ও শাসনকার্য পরিচালনা করে নিজেদেরকে ফেরাউনের মতো রবের আসনে বসিয়ে নিচ্ছে। অপরদিকে ধর্মীয় পর্যায়ে ধর্মীয় পীর-পুরোহিত/দরবেশ বা ধর্মীয়যাজকরা নিজেদের

---

[১৬] বায়হাকি ২৬১, ২০৩৫; তিরমিযী: ৩০৯৫।

অনুসারীদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে, বিভিন্ন মন গড়া বানানো তরীকা পরিচালনার মাধ্যমে রবের আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। আর কালিমার দাবি হচ্ছে, এই সমস্ত ভুয়া রবদেরকে আগে বর্জন করো।

لَا إِلٰهَ লা-ইলাহা এর দুই নম্বর বর্জনীয় বিষয়

اِجْتِنَابُ الْأَنْدَادِ [ইজতিনাবুল আনদাদ] **সকল প্রকার সমকক্ষদের বর্জন করা :**

সাবধানবাণী– ﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

কাজেই জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না। [সূরা বাকারা ২: ২২]

أَنْدَاد আনদাদ অর্থ সমকক্ষ। যে সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ, এই মালিকানায় অন্য কাউকে ভাগ বসানো বা যে সমস্ত গুণ একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য ঐ সমস্ত গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত করাই হলো আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে- এ ধারণা করা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানানো। অনুরূপ আইন-কানুন, বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে, হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে, কুরবানী, নযর-নেয়ায, মান্নত ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে ওসীলা বা মাধ্যম বানানোটাই হলো আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপন করা। কোন মানুষ যখন মান্নতের পশু নিয়ে মাযার, দরগা বা কারো আস্তানায় গিয়ে কুরবানী করে তাহলে ঐ মাযারে যিনি আছেন তাকেই যেন সে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিল। এ পশু যবেহের সময় হাজার বারও যদি بِسْمِ اللّٰهِ [বিসমিল্লাহ] পড়ে তারপরও তা হারাম হবে। কারণ সে তো ঐ মাযার-ওয়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই পশুকে এখানে নিয়ে এসেছে। মুসলিমের কুরবানী হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

তুমি বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। [সূরা আল আনআম ৬: ১৬২]

মুহাব্বাত বা ভালবাসা ঈমানের একটি মৌলিক বিষয়, অথচ ভালবাসার ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়ে ফেলে। এটা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে হতে পারে, আবার স্ত্রী সন্তানসন্ততি বা অন্য কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হতে পারে। মুমিনের উচিত একমাত্র আল্লাহকেই সর্বোচ্চ ভালবাসা।

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾

আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালবাসার মতো তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা মুমিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ়। [সূরা বাকারা ২: ১৬৫]

Contents

لَا إِلٰهَ লা-ইলাহা এর তিন নম্বর বর্জনীয় বিষয়

اِجْتِنَابُ الْاٰلِهَةِ [ইজতিনাবুল আলিহাহ] **সমস্ত বাতিল ইলাহদের বর্জন করা :**

الْاٰلِهَةِ আলিহাহ এর অর্থ: মাবুদ/উপাস্য/যার ইবাদাত করা হয়। اِجْتِنَابُ الْاٰلِهَةِ [ইজতিনাবুল আলিহাহ] এর সারমর্ম হচ্ছে– আল্লাহ ব্যতীত যেসকল দেব-দেবী, মূর্তি, জিন বা মানুষের উলূহিয়্যাত বা সার্বভৌমত্ব মানা হয়, এদের সবাইকে অস্বীকার করা। لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] এর তিন নম্বর দাবি হলো সমস্ত ভুয়া ইলাহদের অস্বীকার করা এবং এসবের অনুসারীদেরকেও বর্জন করা। মুশরিকরা যে বহু ইলাহের ইবাদাত করত তার প্রমাণে মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا﴾

আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেব-দেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া‘আকে, আর না ইয়াগূস, ইয়া‘ঊক ও নাসরকে। [সূরা নূহ ৭১: ২৩]

তাদের ইলাহদের নাম ছিল কুরআনে বর্ণিত নামসমূহ- যারা আল্লাহর নেকবান্দা ছিল। তাদের মৃত্যুর পর মুশরিকরা তাদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে তাদের ইবাদাত করত এবং বিপদে-আপদে তাদেরকে আহ্বান করত। এক কথায় তাদের যাবতীয় ইবাদাত তাদের সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত ছিল। অথচ ঐসব নেকবান্দাগণ তাদেরকে মৃত্যুর পর তাদের ইবাদাত করতে বা তাদেরকে আহ্বান করতে বলে যাননি। পক্ষান্তরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের প্রথম ঘোষণাই হবে لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] অর্থাৎ ঐ সমস্ত বাতিল ইলাহদের প্রথমেই বর্জন করবে, অস্বীকার করবে, ত্যাগ করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

﴿وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾

তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। [সূরা বাকারা ২: ১৬৩]

অসংখ্য বাতিল ইলাহদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ﴾

তবে কি তাদের এমন দেব-দেবী আছে যা তাদেরকে রক্ষা করবে আমার (প্রতিরক্ষা) ছাড়াই? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না, আর তারা আমার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরক্ষাও পাবে না।[১৭] [সূরা আম্বিয়া ২১: ৪৩]

---

[১৭] يصحبون (ইয়ূছহাবুন) এর অর্থ- তারা সঙ্গী পাবে না। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, এখানে এর অর্থ হলো يجارون অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি পেতে তাদেরকে সাহায্য করবে এমন কাউকে তারা পাবে না।

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾

তুমি কি তাকে দেখ না যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে? এর পরেও কি তুমি তার কাজের জিম্মাদার হতে চাও? [সূরা আল ফুরকান ২৫: ৪৩]

এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণে জীবনযাপন করে, এজন্যই প্রবৃত্তিকে তাদের ইলাহ বলা হয়েছে। যদি আমরা রমাযানে রোযা রাখি কিন্তু এমন **শাসকদের আনুগত্য**[১৮] ও অনুসরণ করি যারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেরা চলে না এবং দেশও পরিচালনা করে না, যারা ফেরাউনের মতো নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো আইন তৈরি করে, আমাদের পরিচালনা করে খেয়ালখুশি মতো, তাহলে আমরা রোযার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ইলাহ মানছি কিন্তু শাসনকার্যে ইলাহ মানছি ঐ শাসকবর্গকে। এভাবেই যদি আমরা সালাত, যাকাত আর হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহকে ইলাহ মানি আর সাথে সাথে ঐ সমস্ত রাজনীতিবিদদেরও মানি– যারা আমাদের জন্য নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন-কানুন তৈরি করে; তার মানে দাঁড়ায়- আমরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আল্লাহকে ইলাহ মানলেও রাজনৈতিক বিষয়ে ইলাহ মানছি আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে।

ঈমানের দাবি হলো, একমাত্র আল্লাহর বিধানই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তিনিই সমস্ত ইবাদাতের উপযুক্ত আর একমাত্র তাঁর সামনেই প্রকাশ করা হবে সকল প্রকার বিনয় ও বশ্যতা। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, হেদায়াতদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, ফায়সালাকারী, যখন যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতার অধিকারী এবং সাহায্যকারী। তিনিই একমাত্র সত্তা যার হাতে সকল রাজত্ব, ক্ষমতা এবং তিনিই যাবতীয় বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর সাথে) শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র, মহান। [সূরা হাশর ৫৯: ২৩]

---

[১৮] যে শাসক কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী নিজে চলে ও দেশও পরিচালনা করে তার আনুগত্য করা ফরয। আর যে শাসক কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলে না এবং দেশও পরিচালনা করে না অথবা ওহীর বিধানকে ঘৃণা করে বা বাতিল করে তার আনুগত্য করা যাবে না। স্রষ্টার অসন্তুষ্টিতে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। কোন দেশের মানবরচিত আইন যা কুরআন ও সুন্নাহ বা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক তা বাতিল, তা মানা যাবে না এবং তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

لَا إِلٰهَ লা-ইলাহা এর চার নম্বর বর্জনীয় বিষয়

اِجْتِنَابُ الطَّوَاغِيْتِ [ইজতিনাবুত তাওয়াগীত] **সকল প্রকার তাগূতকে বর্জন করা :**

طَاغُوْتٌ তাগূত শব্দটির মাসদার (ক্রিয়ামূল) হলো طُغْيَانٌ [তুগইয়ান]। যার অর্থ হলো, সীমালঙ্ঘন করা। যেমন নদীর পানি দুই তীর দ্বারা বেষ্টিত থাকাই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু পানি যখন তার দু'তীর তথা সীমা অতিক্রম করে উপরে উঠে আসে তখন আরবিতে বলা হয়, طَاغَتِ الْمَاءُ (পানি সীমালঙ্ঘন করেছে)। তদ্রূপ মানুষ কেবল আল্লাহরই ইবাদাত ও আনুগত্য করবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁরই আইন-কানুন মেনে চলবে। এটাই আল্লাহর নিয়মে স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যখন এই স্বাভাবিক নিয়মকে পাশ কাটিয়ে নিজেই ইবাদাত-আনুগত্য বা উলূহিয়্যাতের দাবি করে বসে তখনই সে তাগূতে পরিণত হয়ে যায়। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, "তাগূত হচ্ছে ঐ সকল উপাস্য, নেতা-নেত্রী, মুরুব্বি- যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যেসকল গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হয়। এরাই হলো পৃথিবীর বড় বড় তাগূত। তুমি যদি এই তাগূতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর তবে অধিকাংশ মানুষকেই দেখতে পাবে যে, তারা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে তাগূতের ইবাদাত করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে (কুরআন ও সুন্নাহ এর কাছে) বিচার-ফায়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগূতের কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগূতের আনুগত্য করে। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাগূতের নির্দেশ পালন করে"।[১৯]

তাগূতের প্রকারভেদ

তাগূতের প্রকার অনেক। তার মধ্যে বর্তমান সমাজের প্রধান প্রধান ৮ প্রকার তাগূত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. ইবলীসঃ

সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং মানুষকে তাগূতে পরিণত করতে উষ্কানি দেয়- এমনকি অন্যান্য তাগূতদেরকেও সে পরিচালনা করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ﴾

---

[১৯] ফাতহুল মাজীদ- ১/২৬, আত-তাওহীদু আওলান- ১/১৯।

হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। আর আমারই ইবাদাত করো, এটাই সরল সঠিক পথ। [সূরা ইয়াসিন ৩৬: ৬০-৬১]
সুতরাং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর উপাসনা/ইবাদাত করা হয় এর মূলে রয়েছে শয়তান। সেই হচ্ছে সমস্ত শিরকের মূল হোতা। তাই শয়তানের সাথে মুমিনের থাকবে চিরশত্রুতা।[২০]

২. শাসক :

আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে/ঘৃণা করে ও অস্বীকার/অমান্য করে এবং মানুষের বানানো শাসনতন্ত্র কায়েম করে এমন শাসকও তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কেউ যদি বলে, এটা একবিংশ শতাব্দি, এ যুগে কুরআনের বিধান অচল/চলবে না, এগুলো মধ্যযুগীয় বর্বরতা, চোরের হাত কাটা, কিসাস, রজম এসব কুরআনিক বিধান বর্তমান যুগে চলে না ইত্যাদি, তাহলে তার ঈমান আর থাকবে না, তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾

তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবি করে, কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়- তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার নিকট হতে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। [সূরা নিসা ৪: ৬০-৬১] আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। [সূরা আন-নিসা ৪: ৬৫]

---

[২০] শয়তান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের প্রকাশিত **"শয়তান থেকে বাঁচার কৌশল"** বইটি পড়ার অনুরোধ রইল। -সম্পাদক।

৩. বিচারক :

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার/অমান্য করে, বাদ দেয়/বাতিল করে যে বিচারক বা সমাজপতি অন্য কোন মানবরচিত আইন-বিধান বা সংবিধান দিয়ে ফায়সালা করে তারাও তাগূতের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা কাফির। [সূরা মায়েদা ৫: ৪৪] ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা যালিম। [সূরা মায়েদা ৫: ৪৫] ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক। [সূরা মায়েদা ৫: ৪৭]

সুদ্দি রহ. বলেন, যদি (কেউ) ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর ওহীর বিপরীতে ফতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টা করে তবে সে কাফির। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে তার হুকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর বিধানকে) অস্বীকার করল না, কিন্তু তা (আল্লাহর বিধান) মোতাবেক বলল না, সে যালিম ও ফাসিক।[১]

৪. ইলমে গায়েবের দাবিদার :

যারা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করে তারাও তাগূত। এদের মাঝে রয়েছে জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎ-বক্তা/গণক, পীর-ফকির, ধর্মীয়যাজক-পুরোহিত ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ﴾

সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না। জমিনের গহীন অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই, নেই কোন ভেজা ও শুকনো জিনিস যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই। [সূরা আনআম ৬: ৫৯]

৫. পীর-পুরোহিত :

আলেম-উলামাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে তাগূতকে বর্জন করার ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করা। কিন্তু জনগণের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ পেয়ে কতিপয় নামধারী আলেম পীর-পুরোহিত/ধর্মীয়যাজক সেজে মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে। এরা মানুষের থেকে দুভাবে ইবাদাত নেয়।

---

[১] তাফসীর ইবনু কাছীর (ড. মুজিবুর রহমান), খন্ড: ২ পৃ: ৮৩৬।

আক্বীদা বা বিশ্বাসগতভাবে এবং আমলগতভাবে। যেমন তারা বলে, যার পীর নাই তার শির নাই, যার পীর নাই শয়তানই তার পীর, পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরয। এরকম আরো অনেক কিছু বলে থাকে। অথচ ফরয বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কোন ইবাদাতকে ফরয বলা যায় না। পীর-ছুফিগণ মনগড়া ইবাদাত তৈরি করে। মনগড়া বহু তরীকা নিজেরা তৈরি করে। আবার এক এক তরীকার এক এক যিকির। এ সবকিছুই আল্লাহর শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বাতিল/ভ্রান্ত একটি শরীয়ত যা পরিত্যাজ্য, যা পীর-পুরোহিতরা নিজেরা তৈরি করেছেন। অথচ এ জাতীয় শরীয়ত তৈরি করার অধিকার আল্লাহ তা'আলা কাউকে দেননি। সুতরাং এরাও তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾

তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। [সূরা শূরা ৪২: ২১]

﴿وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

তাদের মধ্যে যে বলবে যে, 'তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ', তাহলে আমি তাকে তার প্রতিফল দেব জাহান্নাম। যালিমদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

[সূরা আম্বিয়া ২১: ২৯]

৬. যাদুকর :

যাদুকরেরাও তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। যাদু হচ্ছে এমন কিছু মন্ত্র এবং ঝাড়ফুঁক, যা দেহ বা মনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষ অসুস্থ হয়ে মারা যায় অথবা স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার মতো নিকৃষ্ট কাজ সংঘটিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে: এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত (হারুত) ও মারূতের (মারুতের) উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাত না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী করো না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হতো; আর এদের কোন উপকার হতো না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোন অংশই থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘণ্য, যদি তারা জানত! [সূরা বাকারা ২:১০২]

৭. তাক্বলীদুল আবা বা বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করা :

বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা যত রসম-রেওয়াজ নিয়ম-নীতি ও কুসংস্কার রয়েছে, সেগুলোকেই শক্তভাবে ধরে রাখা, তা যতই কুরআন-সুন্নাহবিরোধী হোক না কেন; এটা কোন নতুন রোগ নয়। পূর্বযুগের উম্মতরাও এই রোগে আক্রান্ত ছিল। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলগণ عليهم السلام যখনই মানুষকে আল্লাহর অবতীর্ণ ওহীর পথে তথা হক্বের দিকে আহ্বান করেছেন তখনই তারা পূর্বপুরুষ ও আকাবিরদের দোহাই দিয়ে বলত, এটা আমার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে এসেছে, বাপ-দাদারা কি ভুল করছে নাকি? অমুক অমুক বড় বুযুর্গ/হুজুরে কেবলা এ কাজ করেছেন, তারা কি কম বুঝেছেন? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন-

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ জিনিসের অনুসরণ করো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই উপর চলব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝত না এবং সঠিক পথে চলত না তবুও (কি তারা তারই অনুসরণ করবে)? । [সূরা বাকারা ২:১৭০]

তাই যারা কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাদের বাপ-দাদাদের, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করবে তারাও তাগূতের (সীমালঙ্ঘনকারীদের) অন্তর্ভুক্ত।

৮. হাওয়া বা প্রবৃত্তি/খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা :

মনে মনে কোন কিছুকে ভালবেসে তাকে পাওয়া, অর্জন করা বা তার আনুগত্য করা হচ্ছে হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ না করে মন যা চায় তাই করা।

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾

তুমি কি তাকে দেখ না যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে? এর পরেও কি তুমি তার কাজের জিম্মাদার হতে চাও? [সূরা আল ফুরকান ২৫: ৪৩]

এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণে জীবনযাপন করে। এজন্যই প্রবৃত্তিকে তাদের ইলাহ বলা হয়েছে। তাই তাদের নিজ প্রবৃত্তিও তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। এরকম নিজের প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

তাগূতকে অস্বীকার করা ফরয

মহান আল্লাহ আদম সন্তানের উপর প্রথম যা ফরয করেছেন, তা হলো [কুফর বিততাগূত] **তাগূতকে অস্বীকার করা** এবং [ঈমান বিল্লাহ] আল্লাহকে **স্বীকার করা**। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾
প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদাত করো আর তাগূতকে বর্জন করো। [সূরা নাহল ১৬: ৩৬]

﴿فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾
অতএব যে তাগূতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল যা কখনও ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। [সূরা বাকারা ২: ২৫৬]

দ্বীনের মজবুত রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণের পূর্বশর্ত হলো দুটি। প্রথমত: তাগূতকে অস্বীকার করা। **দ্বিতীয়ত:** আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওযুর চার ফরযের মধ্যে যে কোন একটি শর্ত বা ফরয ত্যাগ করলে যেমন ওযু হয় না এবং উক্ত ওযু দ্বারা সালাত আদায় করলে উক্ত সালাতও বাতিল বলে গণ্য হয়– অনুরূপভাবে সমস্ত তাগূতকে বর্জন না করেই কেউ যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাহলে তার সে ঈমানও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং সমস্ত তাগূতকে বর্জনের উপরই নির্ভর করছে আমাদের ঈমানের বিশুদ্ধতা।

তাগূতকে কীভাবে অস্বীকার করব?

নিম্ন লিখিত উপায়ে তাগূতকে অস্বীকার করা যায়–

১। তাগূতের ইবাদাত বাতিল- এ আকীদা পোষণের মাধ্যমে :

﴿ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾
এজন্য যে, আল্লাহ- তিনিই সত্য, আর তাঁকে বাদ দিয়ে তারা অন্য যাকে ডাকে তা অলীক, অসত্য; আর আল্লাহ, তিনি তো সর্বোচ্চ, সুমহান। [সূরা হজ্জ ২২: ৬২]

২। তাগূতকে পরিত্যাগ ও তাগূত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে :

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾
প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো আর তাগূতকে বর্জন করো। [সূরা নাহল ১৬: ৩৬]

৩। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে :

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهٗ﴾
ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথিদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল- তোমাদের সঙ্গে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে

তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। [সূরা মুমতাহিনা ৬০: ৪]

الدرر السنية لعلماء النجد নামক গ্রন্থের ১/৯৩ পৃষ্ঠায় অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

এ আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ যে, মানুষ যদি তার রবের আনুগত্য, ভালবাসা এবং তিনি যা পছন্দ করেন তার ইবাদাত করে, কিন্তু মুশরিকদেরকে (যারা তাগূতের দাসত্ব করে) এবং তাদের কাজকে ঘৃণা না করে, বিরোধিতা না করে, তবে সে তাগূতকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। আর যে ব্যক্তি তাগূতকে পরিত্যাগ করতে পারেনি সে ইসলামেও প্রবেশ করতে পারেনি। অতএব সে কাফের– যদিও সে রাত জেগে ইবাদাত করার মাধ্যমে আর দিনে রোযা রাখার মাধ্যমে উম্মতের সবচেয়ে বড় আবেদ ও বুযুর্গ ব্যক্তি হয়ে থাকে। তার অবস্থা হচ্ছে ঐ নামাযির মতো, যে ফরয গোসল ব্যতীত সালাত আদায় করল অথবা তীব্র গরমের দিনে নফল রোযা রেখে রমাযান মাসে দিনের বেলা অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকল।[২২]

৪। দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে :

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ - أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ﴾

সে বলল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা কীসের পূজা করে যাচ্ছ? তোমরা আর তোমাদের আগের পিতৃপুরুষরা? তারা সবাই আমার শত্রু, বিশ্বজগতের পালনকর্তা ছাড়া। [সূরা শুআরা: ২৬: ৭৫-৭৭]

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا﴾

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কাফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, শয়তানের ফন্দি অবশ্যই দুর্বল। [সূরা নিসা ৪: ৭৬]

সুতরাং তাগূতের সাথে মুমিনের থাকবে সুস্পষ্ট শত্রুতা। মুমিনরা তাগূতের বিরোধিতা করবে এবং প্রচেষ্টা চালাবে– কীভাবে তাগূতের দাসত্বকে মিটিয়ে দিয়ে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে মানুষকে নিয়ে আসা যায়।

[২২] মাজমুআতুত-তাওহীদ আর-রিসালাতুল উলা ১৪-১৫ পৃঃ।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দ্বিতীয় অংশ إِلَّا اللهُ ইল্লাল্লাহ যা গ্রহণীয়

إِلَّا اللهُ [**ইল্লাল্লাহ**] এর সারকথা হলো: আল্লাহকেই সত্যিকার ইলাহ, মাবুদ ও উপাস্য হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা। প্রথম অংশের চারটি বিষয় সম্পর্কে আগে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে চার প্রকার শিরক, অর্থাৎ এক সত্য আল্লাহ ছাড়া আর যত মিথ্যা ও বাতিল রব রয়েছে, ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য রয়েছে, সমকক্ষ রয়েছে, যত প্রকার তাগূত রয়েছে সব কিছুকে প্রথমেই বর্জন করে হৃদয়-আত্মাকে সম্পূর্ণ [Clear] পরিষ্কার করে। ভয়-ভীতি সহকারে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য উজাড় করে দিয়ে এ বিশ্বাস রাখা যে, সমস্ত ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার হলেন আল্লাহ। ইবাদাত চলবে এক আল্লাহর জন্য। সিজদা চলবে এক আল্লাহর জন্য। কুরবানী চলবে এক আল্লাহর জন্য। মান্নত চলবে এক আল্লাহর জন্য। বিধানও চলবে এক আল্লাহর। এ বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে যিনি দ্বিতীয় অংশের সাক্ষ্য দিবেন إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] একমাত্র তিনিই হবেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর পূর্ণ হকদার আর তখনই তিনি হবেন একজন খাঁটি মুমিন। পুরাতন বিল্ডিংয়ে রং করতে হলে পূর্বের রং ঘষে-মেজে, ধুয়ে-মুছে [Clear] পরিষ্কার করে নতুন রং করলে তা স্থায়ী হয়, আর পুরাতন ময়লা রঙের উপর রং করলে যে কোন মুহূর্তে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে; ঠিক তেমনিভাবে لَا إِلٰهَ [লা-ইলাহা] এর মাধ্যমে অন্তরটাকে সমস্ত গাইরুল্লাহ থেকে [Clear] পরিষ্কার করা হয়। আর إِلَّا اللهُ [ইল্লাল্লাহ] দ্বারা নতুন রং তথা আল্লাহর রঙে রঙ্গিন করা হয়। পবিত্র কুরআনে এটাকেই বলা হয়েছে আল্লাহর রঙে রঙ্গিন হয়ে যাওয়া।

ইরশাদ হচ্ছে– ﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ﴾

(আমাদের দ্বীন) আল্লাহর রঙে রঞ্জিত এবং আল্লাহর রং অপেক্ষা আর কার রং উত্তম হবে? এবং আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। [সূরা বাকারা ২: ১৩৮]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সারমর্ম

আমরা জানি, ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। আর তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ]। এ কালিমাকে স্বীকার করার অর্থ/মানে হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো মেনে নেয়া–

- আল্লাহকে এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, জীবন ও মৃত্যুর-মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বলে বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা। আর কেউ তার একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব বা আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহকেই আমাদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদাত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না করা এবং কাউকে ভয় না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে প্রিয় না জানা এবং তাকেই অসীম করুণার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।
- কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন-বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়াত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা। ছোট-বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা।[২৩]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলি

তাওহীদী কালিমা তথা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর কতগুলো শর্ত আছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এ শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। তাওহীদ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর কয়েকটি শর্ত নিচে আলোচনা করা হলো :

[২৩] কালিমা তাইয়েবা, আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী (রহ.– পৃ. ৭৭-৮০)

১. [ইলম] জ্ঞান:

তাওহীদের প্রথম শর্ত হলো তাওহীদের কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

সুতরাং জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; অতএব ক্ষমাপ্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের পাপের জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ১৯]

যে ব্যক্তি لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর সাক্ষ্য দিল; আবার গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন/কারও/কিছুর ইবাদাতও করল, তার এ সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই, যদিও সে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং ইসলামের কিছু কাজকর্ম করে।

২. [আল-ইয়াক্বীন] নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস স্থাপন:

আমাদেরকে অবশ্যই শাহাদার প্রথম শর্ত [তাওহীদ ও রিসালাত] এর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর রাসূল ﷺ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, বিচার দিবস, তাক্বদীর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারেও কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ ﷻ ও রাসূল ﷺ এর বক্তব্যের বিরোধিতা করা যাবে না।

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে সীমাহীন পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। [সূরা নিসাঃ ৪: ১৩৬]

৩. [আস-সিদক্ব] সত্যবাদীতা:

একজন মুমিনকে তাওহীদের কালিমায় সত্যবাদী হতে হবে। সে মুখে কালিমা উচ্চারণ করার পর যদি অন্তরে তার বিপরীত ধারণা পোষণ করে তবে সে মুমিন হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। [সূরা মুনাফিকূন- ৬৩: ১]

এখানে মুনাফিকরা নবী ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কথাটাকে তাগিদ দিয়ে বলেছে **"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি"**। আর সাক্ষ্য বলা হয় আন্তরিক

বিশ্বাসসহ কোন কথা বলাকে। যেহেতু তারা আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কথাটি বলেনি, এ কারণে "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি" তাদের এ কথাটি বলা মিথ্যা হয়েছে।

৪. [আল-ইখলাস] অন্ত্মরে একাগ্রতা:

কালিমার দাবি অনুযায়ী বান্দার সকল ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করাই হচ্ছে ইখলাস। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾

তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন। [সূরা বায়্যিনাহ ৯৮: ৫]

৫. [আল-কবুল] প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঈমানের স্বীকৃতি:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এ কালিমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর অর্থ জানল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করল, কিন্তু গ্রহণ করল না, তাহলে সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। মক্কার কাফির-মুশরিকরা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর অর্থ ভাল করেই জানত। আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করত; কিন্তু অহংকারবশত গ্রহণ করত না। ফলে তারা কাফির-মুশরিকই রয়ে গেল। তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর অর্থ জেনে-বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ - وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ﴾

যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) মাবুদ নেই তখন তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে বর্জন করব? [সূরা সাফফাত ৩৭: ৩৫, ৩৬]

৬. [আল-ইনকিয়াদ বা আত্মসমর্পণ] কুরআন ও সুন্নাহ এর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর অর্থ জানা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং বাস্তবে ইবাদাতের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার পর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ] এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। [সূরা নিসা ৪: ৬৫]

৭. [আল-মুহাববাত] ভালবাসাঃ

এ কালিমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে হবে এবং সমস্ত প্রকার ভালবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই। আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। (আল ওয়ালা ওয়াল বারা)ঃ আমাদের যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর জন্য ভালবাসতে হবে এবং তাঁর জন্যই ঘৃণা করতে হবে। ইবরাহীম عليه السلام এর ঘটনা (আল ওয়ালা ওয়াল বারা) এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাঁর পিতা আযরের মিথ্যা প্রভুদের অস্বীকার করে বলেছিলেন "তোমার ও আমার বিরোধ কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।" সুতরাং মুমিনকে অবশ্যই হক (সত্য) ভালবাসতে হবে এবং বাতিল (মিথ্যা) ঘৃণা করতে হবে।

এসকল শর্ত মেনে চলা ব্যতীত একজন বান্দা কুফরী ও মুনাফিকী থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাই এসকল শর্ত মেনে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর সাক্ষ্য দিতে হবে।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য আল্লাহ নিজে দিয়েছেন

এটি এমনই এক মহান কালিমা বা বাক্য যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ سبحانه وتعالى, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত জ্ঞানবানরা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَآئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কেউ ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মালাইকা/ফেরেশতা, জ্ঞানবানগণ ও সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই।

[সূরা আল-ইমরান ৩: ১৮]

অর্থাৎ যারা জ্ঞানী তারা সততা এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, যারা অজ্ঞ, মূর্খ, জাহেল তারাই এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ﴾ কাজেই জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ১৯]

Contents

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দানের আহ্বান

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ أَدْعُوْٓا إِلَى اللهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

বলো, এটাই আমার পথ, আল্লাহর পথে আহ্বান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। আল্লাহ মহান, পবিত্র; আমি কক্ষনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হব না। [সূরা ইউসুফ ১২: ১০৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

হে মানুষেরা! বলো, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" তাহলেই তোমরা সফল হবে।[২৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلٰى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنْ هُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায বিন জাবাল رضي الله عنه-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বললেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। সর্বপ্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই [لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল- এর সাক্ষ্য দান। এ বিষয়ে যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, মহান আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, মহান আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরিবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধান থাকবে। আর মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করে চলবে। কেননা মাযলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দা নেই।[২৫]

---

[২৪] ইবনে খুযায়মাহ: ১৫৯, মুসনাদে আহমাদ: ১৬০২২-২৩,।

[২৫] সহীহ বুখারি ৪৩৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৮৩, সুনানে আবু দাউদ ১৫৮৪।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর আহ্বানে পূর্ববর্তীরা কী বলেছিল

প্রিয় পাঠক! আসুন এবার জেনে নেই– নবী-রাসূলরা عليهم السلام যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর দাওয়াত দিয়েছিলেন তাদের জাতিকে তখন সেই জাতির লোকেরা কী বলেছিল। রাসূল ﷺ যখন তার জাতিকে আহ্বান জানালেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] বলতে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) মাবুদ নেই এর সাক্ষ্য দিতে, তখন মুশরিকরা বলেছিল,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

সে কি অনেক মাবুদের পরিবর্তে এক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক আশ্চর্য ব্যাপার! [সূরা সোয়াদ ৩৮: ৫]

﴿وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾

এবং তারা বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে বর্জন করব? [সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭: ৩৬]

বুঝা গেল, মুশরিকরা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর অর্থ ঠিকমতই বুঝেছিল যে, এক আল্লাহকে মেনে নিলে সমস্ত দেব-দেবী, তাগূত ও গাইরুল্লাহকে বর্জন করতে হবে। নতুবা তারা (আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করব?) এ কথা বলল কেন? আল্লাহ سبحانه وتعالى বলেন–

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾

আর যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালকের একত্বের কথা (তাদের সামনে) উল্লেখ করো, তখন তারা (সত্য থেকে) পালিয়ে পিছনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। [সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ৪৬]

তারা বলে, আমাদের লাত কোথায় গেল? উযযা কোথায় গেল? মূর্তি/প্রতিমা কোথায় গেল? পীর কোথায় গেল? খাজা বাবা, গাঁজা বাবা কোথায় গেল? একি বলে! শুধুমাত্র এক ইলাহ মানতে হবে! এক আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে! এতো বড় আজব ব্যাপার! কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। [সূরা যুমার ৩৯: ৪৫]

মহান আল্লাহ এখানে মক্কার কাফের-মুশরিকদের চিত্র তুলে ধরেছেন। যখন এক আল্লাহ তথা তাওহীদের (আল্লাহর একত্বের) আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা খারাপ হয়ে যায়, রাগে-ক্ষোভে, অন্তরটা ফেটে যেতে চায়। শরীরের পশমগুলো দাঁড়িয়ে যায়, চেহারাটা মলিন হয়ে যায়। আর যদি আল্লাহর সাথে

তাদের নেতা, পীর, বুযুর্গ, মূর্তি/প্রতিমা তথা গাইরুল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা আনন্দে উল্লাসিত হয়, খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যায়, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

ইসলাম বলে গাইরুল্লাহকে বর্জন করতে হবে, মুশরিকরা বলে গাইরুল্লাহকে বর্জন করা যাবে না। গাইরুল্লাহর নামে নযর- মান্নত বন্ধ করা যাবে না।

কুরআন মাজীদ বলছে আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহ (তথা মূর্তি/প্রতিমা, পীর, বুযুর্গ, ওলী-আউলিয়াদের)-কে যোগ করার এ রোগ শুধু মক্কার মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, রোগ একটাই কিন্তু ডাক্তার পরিবর্তন হচ্ছিল। যখনই নবী-রাসূলগণ عليه السلام মুশরিক সম্প্রদায়কে তাওহীদের (একত্ববাদের) কথা বলেছেন এবং তাদের কাছে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর মূল দাবি পেশ করেছেন, তখনই তারা (কাফেররা) জবাবে বলেছে–

﴿قَالُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾

তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করো।

[সূরা ইবরাহীম ১৪: ১০]

কাওমে নূহ:

নূহ عليه السلام যখন তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার জাতি উত্তর দিয়েছিল–

﴿وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেব-দেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুয়া'আকে, আর না ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসরকে। [সূরা নূহ ৭১: ২৩]

নূহ عليه السلام তার জাতিকে এক ইলাহের (আল্লাহর) দিকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি কোন পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেননি। অথচ তার জাতি প্রত্যুত্তরে পাঁচজন আল্লাহ ওয়ালার (নেককার বান্দার) নাম উল্লেখ করল। বতর্মানেও যখন তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন মানুষ বিভিন্ন পীর-বুযুর্গের কথা উল্লেখ করে। আমার মুফতী সাহেব, পীর সাহেব কেবলা, হুজুর কেবলা তারা কি তোমাদের চেয়ে কম বুঝেছিলেন? তারা কি ভুল করেছেন?

কাওমে হূদ : ﴿قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا﴾

তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যাতে আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি। আর আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদাত করত তা ত্যাগ করি?

[সূরা আরাফ ৭: ৭০]

অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইবাদাত করতে আপত্তি করেনি, কিন্তু তাদের আপত্তি ছিল তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। এবার হূদ ﷺ এর জাতি অহংকার এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করে হূদ ﷺ-কে বলল–

﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾

তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যগুলোকে ত্যাগ করতে পারি না, আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই। [সূরা হূদ ১১: ৫৩]

এই আয়াতেও প্রমাণিত হলো হূদ ﷺ গাইরুল্লাহর ইবাদাতের অনুমতি দেননি। আর তার জাতি গাইরুল্লাহর ইবাদাত ছাড়তে পারেনি।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর গুরুত্ব ও ফযীলত

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, এর মর্যাদা যে কত উচ্চ তা এ ক্ষুদ্র পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তবুও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এ কালিমার গুরুত্ব তুলে ধরছি।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর গুরুত্ব:

- এটি ইসলামের মূল কালিমা। এর সাক্ষ্য দানই ইসলামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। কেউ বুঝে-শুনে এ কালিমার সাক্ষ্য দিলে সে হবে মুসলিম, আর অস্বীকার করলে সে হবে কাফের। এ হচ্ছে এমন এক কালিমা যা মানুষের ঈমান এবং কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করছে তাদের জন্যও অবশ্যই জরুরি যে, তারা বুঝে-শুনে এ কালিমার সাক্ষ্য দেবে; অন্যথায় তাদেরও মুসলিম দাবি করা বৃথা হবে। রাসূল ﷺ যখন মুয়ায ﷺ-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, “নিশ্চয় তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের) এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সর্বপ্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই [لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য দান।[২৬]
- সকল নবী-রাসূল ﷺ এর মূল মিশনই ছিল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর দিকে আহ্বান করা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

[২৬] সহীহ বুখারি ৪৩৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৮৩, সুনানে আবু দাউদ ১৫৮৪।

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদাত করো। [সূরা আম্বিয়া ২১: ২৫]

সুতরাং কালিমার এ দাওয়াতই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত, এ কালিমাকে মেনে নেয়াই হেদায়াতের রাস্তা গ্রহণ করা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকে মেনে নেয়া।

- এ কালিমা ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শাহাদাতাইন বা দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (আল্লাহর) ঘরে হজ্জ করা এবং রমাযান মাসে সিয়াম পালন করা।[২৭]

এটা যেহেতু ইসলামের মূল ভিত্তি, এখন কেউ যদি বলে আমি মুসলিম, আমার দ্বীন ইসলাম তাহলে অবশ্যই তাকে এ কালিমার সাক্ষ্য জেনে-বুঝে দিতে হবে এবং এটাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর ফযীলত :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর সাক্ষ্য যে ব্যক্তি দেয় সে মুসলিম, সে ব্যক্তি সবোর্ত্তম জিনিস "ঈমান" লাভ করে। সে আল্লাহর এমন বান্দাতে পরিণত হয়- যে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর অনেক ফযীলত।

সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কিছু ফযীলতের কথা তুলে ধরছি– মানবজীবনের চূড়ান্ত সফলতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। আর এ কালিমা স্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আর আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট, তার আবাসস্থল জান্নাত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে, সে জানে (ও মানে) আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৮]

তবে অবশ্যই এর জন্য শর্ত হচ্ছে বান্দাকে সমস্ত প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে, যাবতীয় ইবাদাত এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদন করতে হবে। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

[২৭] সহীহ বুখারী ৮; সহীহ মুসলিম ১৬।

[২৮] সহীহ মুসলিম ১৪৫; সহিহ ইবনে হিব্বান ২০১।

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। [সূরা-মায়েদা ৫: ৭২]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এর যিকির (স্মরণ) করতে সমস্ত মাখলুক আদিষ্ট। এ কালিমার যিকির সর্বোত্তম যিকির।

নবী ﷺ বলেন– أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[২৯]

এ কালিমা যে স্বীকার করে নেবে এবং শিরক মুক্ত থাকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার সম্পদ এবং রক্ত হারাম। তবে ইসলামের কোন অধিকার নষ্ট করলে ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব আল্লাহর উপর।[৩০]

যদি কোন ব্যক্তি শিরক হতে বেঁচে একনিষ্ঠভাবে তাওহীদের অধিকারী হয়, তবে অবশ্যই তার একত্ববাদ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। ফলে এটা তার সবচেয়ে বড় কারণ হবে সুখের জন্য এবং তার গুনাহ মাফের জন্য ও পাপকে দূরীভূত করার জন্য; যা নবী ﷺ এর হাদীসে এসেছে–

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

যে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর ঈসা عليه السلام আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহর ঐ কথা, যা মরিয়ম عليها السلام এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহ হতে প্রেরিত রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য– তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোন আমলই করুক না কেন।[৩১]

এই সমস্ত সাক্ষ্য যখন কোন মানুষ দেবে, তখন তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা ওয়াজিব হবে, যা চিরস্থায়ী নিয়ামতের জায়গা, শিরক ব্যতীত যদিও তার কোন পাপ থাকে। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

---

[২৯] তিরমিযী: ৩৩৮৩, ইবনে মাজাহ: ৩৮০০।

[৩০] সহীহ বুখারি: ৬৯২৪, সহীহ মুসলিম: ২০, মুসনাদে আহমাদ ২৭২১৩।

[৩১] সহীহ বুখারী: ৩৪৩৫, সহীহ মুসলিম: ২৮।

(হে আদম সন্তান!) যদি তুমি কোন শিরক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভর্তি পাপরাশি নিয়ে হাজির হও, তবে আমি তোমার সাথে দুনিয়া ভর্তি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।[৩২] অপর হাদীসে এসেছে,

مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ

যে আল্লাহর সাথে কোন শিরক করা ব্যতীত সাক্ষাৎ করবে, অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শিরকের উপরে মারা যাবে অবশ্যই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৩৩]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উপকারিতা

[দুনিয়াতে]

- নিরাপত্তা ও হেদায়াত লাভ।
- আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও মদদ লাভ।
- প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ।
- একতা ও ঐক্য সৃষ্টি।
- মুসলিম উম্মাহর শক্তি অর্জন।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব হাসিল।
- সকল ইবাদাত কবুল হওয়ার আশা।
- দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি লাঘব।
- অপছন্দনীয় জিনিসিসমূহ হালকা অনুভব করা এবং দুঃখ-দুর্দশা সহজ হওয়া।
- মানুষের গোলামি, ভয়-ভীতি এবং তাদের থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মাখলুকের উদ্দেশ্যে আমল করা থেকে সম্পূর্ণ আযাদ ও স্বাধীন হওয়া।
- ঈমানের ভালবাসা ও হৃদয়ের সৌন্দর্য এবং কুফরী অপকর্ম ও অবাধ্যতাকে ঘৃণা।

[আখিরাতে]

- কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ।
- হাশরের ময়দানে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত।
- জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী না হওয়া।
- পরিপূর্ণ তাওহীদ হলে সরাসরি জান্নাত লাভ।
- কিয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুপারিশ লাভ।[৩৪]

[৩২] সহীহ মুসলিম: ২৬৮৭, ইবনে মাজাহ: ৩৮২১।
[৩৩] সহীহ মুসলিম: ৯৩ সহীহ বুখারী: ১২৯।
[৩৪] তাওহীদ ও তার উপকারিতা, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬, শাইখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানী।

তাওহীদ কী?

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্রীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা। তাওহীদ (একত্ববাদ) হলো– এক বাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরূপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন। তাওহীদ হচ্ছে– একমাত্র সত্য ইলাহের/মাবুদের জন্য একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দা হয়ে যাওয়া। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়াই হচ্ছে তাওহীদের মূল মর্ম।

তাওহীদ কত প্রকার?

প্রকৃত পক্ষে তাওহীদের কোন প্রকারভেদ নেই। ওলামায়ে কেরাম বুঝার সুবিধার্থে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এর আলোকে তাওহীদকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

- তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ)
- তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ)
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত (নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ)

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ) **এর পরিচিতি :**

এই তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, কেবল আল্লাহকেই রব হিসেবে বিশ্বাস করা এবং স্বীকৃতি দেয়া। 'রব' অর্থ প্রতিপালক/লালনপালন কারী, তাই দুনিয়া জুড়ে সমগ্র সৃষ্টিকে লালনপালন করতে যা কিছুর প্রয়োজন হয়, সবকিছু কেবল একজনই করছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ অংশগ্রহণকারী নেই বা শরীক নেই। অর্থাৎ জানতে হবে, মানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা কেবলমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। তিনি রিযিকদাতা, মহাব্যবস্থাপক এবং সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি। সকল ক্ষমতার উৎসও কেবল তিনি। মোটকথা আল্লাহর কার্যাবলিতে তাঁর এককত্ব বিশ্বাস করাকে তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ বলে। কুরআনের বহু আয়াতে এই তাওহীদের ভিত্তি পাওয়া যায়। যেমন মৌলিক সৃষ্টিকর্তা যে এক আল্লাহই, তিনি ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই সে কথা মহান আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করে মানব জাতীকে বলেছেন,

﴿يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তিনি ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন থেকে রিযিক দান

করে? তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তাহলে কীভাবে তোমরা বিপথগামী হচ্ছ? [সূরা ফাতির ৩৫:০৩]

অনুরূপ, ﴿أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾

তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, নাকি আমি তা বর্ষণ করি? [সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৬৯]
মুসলিম জাতিকে বিজয় দান, বিপদ মুক্ত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ/মাবুদ বা অন্য কোন রব নেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। বলা বাহুল্য, এই তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যাবে, যদি বিশ্বাস করা হয়- তথাকথিত গাউছ, কুতুব, আবদাল অথবা কোন পীর-ফকির সন্তান দান, বরকত দান, বিপদ মুক্তি/উদ্ধার ইত্যাদির ক্ষমতা রাখে। অনুরূপ যে বিশ্বাস করবে যে, কোন বুযুর্গের কারণে বা অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি বা রোদ হয়, সেও এই তাওহীদের ভিত্তি চুরমার করে শিরকের নিকষ কালো আঁধারে হারিয়ে যাবে।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ**) এর পরিচিতি :**

- সমগ্র সৃষ্টিকুলের ইবাদাতের হকদার কেবল মাত্র, শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলা- এ কথা জানা, বিশ্বাস করা এবং বাস্তবে আমল করা।
- মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র দ্বীনকে খালিস করা এবং কেবল আল্লাহর জন্যই যে কোন ইবাদাত পালন করাকে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বলে।

আল্লাহ তা'আলা শিখাচ্ছেনঃ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।

[সূরা ফাতিহা ১: ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো শিখাচ্ছেনঃ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

তুমি বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। [সূরা আল আনআম ৬:১৬২]

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ**) এর পরিচিতি:** 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' এর তাৎপর্য হলো : আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর একত্ববাদ। আর তা হলো, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যেসকল সুন্দর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলির বিবরণ এসেছে তা হুবহু আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত- এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণাঃ

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। [সূরা ত্বাহা ২০:৮]
তবে কোন অবস্থাতেই আল্লাহর কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করা, বিকৃত ব্যাখ্যা করা, উপমা ও ধরন/সদৃশ বর্ণনা করা চলবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। [সূরা শূরা ৪২:১১]

তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারীর পুরস্কার জান্নাত

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সম্মুখে সমস্ত জাতিকে উপস্থাপন করা হলো। তখন আমি এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। এরপর আরো একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে মাত্র দু'জন লোক রয়েছে। আবার এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে কোন লোকই নেই। ঠিক এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট জনগোষ্ঠী পেশ করা হলো। তখন আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো, এরা হচ্ছে মূসা عليه السلام এর উম্মত। এরপর আরো একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর দিকে আমি তাকালাম। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি উঠে বাড়ির অভ্যন্তরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা ঐ সব ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করে দিল। কেউ বলল, তারা বোধ হয় রাসূল ﷺ এর সাহচর্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গ। আবার কেউ বলল, তারা বোধ হয় ইসলামী পরিবেশে অথবা মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে তারা কাউকে শরীক করেনি। তারা এ ধরনের আরো অনেক কথা বলাবলি করল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে উপস্থিত হলে বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন, তারা হচ্ছে ঐ সব লোক- যারা ঝাড়ফুঁক করে না, পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করে না, শরীরে উল্কি আঁকে না এবং যারা তাদের রবের উপর ভরসা করে। একথা শুনে ওয়াকাশা বিন মিহসান দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ ﷻ আমাকে এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, আমি দু'আ করলাম, তুমি তাদের দলভুক্ত। অতঃপর অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, তোমার পূর্বেই ওয়াকাশা সে সুযোগ নিয়ে গেছে।[৩৫]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যারা আল্লাহর উপর ভরসা/নির্ভর করে (তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে) ঝাড়ফুঁক করে না বা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ণয় করে না এরকম সত্তর হাজার লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুবহান-আল্লাহ।

[৩৫] সহীহ বুখারী: ৫৭৫২, সহীহ মুসলিম ২২০, মুসনাদে আহমাদ ২৪৪৮।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদের বাস্তবায়ন

তাওহীদের বাস্তবায়ন হলো তাওহীদকে শিরক, বিদআত ও পাপাচার মুক্ত করা। তাওহীদকে কলুষ মুক্ত করা। যারা নিজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যেমন- নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর তাওহীদকে বাস্তবায়ন করবে এবং বড় শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করা হতে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর যারা ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকবে এবং বড় ও ছোট পাপ হতে দূরে থাকবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾

যারা ঈমান এনেছে আর যুলুম (অর্থাৎ শিরক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি, তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে; আর তারাই হলো সঠিক পথপ্রাপ্ত।

[সূরা আনআম ৬: ৮২]

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোন দলীল প্রমাণ নেই, তবে একমাত্র তার প্রতিপালকের কাছেই তার হিসাব হবে। কাফেরগণ অবশ্যই সফলকাম হবে না। [সূরা মুমিনূন ২৩: ১১৭]

তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক

শিরকের শাব্দিক অর্থ হলো, শরীক করা, অংশীদার স্থাপন করা। ইংরেজিতে বলা হয়– Polytheism, Associate, Partner. আর সাধারণ অর্থে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা বা আল্লাহর পাশাপাশি গাইরুল্লাহকে ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য ও রব হিসেবে গ্রহণ করা। সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ ﷻ-কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, ভাগ্যবিধাতা এবং সর্বময়-ক্ষমতার একক অধিপতি এবং একমাত্র উপাসক হিসেবে মনে না করাকে শিরক বলে। অতএব শিরক হচ্ছে অংশীদারিত্ব আর এ অংশীদারিত্ব হচ্ছে আল্লাহর উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত এবং সিফাতের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা– অর্থাৎ সৃষ্টির ছোট-বড় কোন বস্তু যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, নবী-ওলী-দরবেশ, পীর-ফকির অথবা কোন নেক মানুষকে আল্লাহর সাথে পূর্ণ বা আংশিক সাহায্যকারী মনে করা। যেমন– মহান আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলির ক্ষেত্রে সৃষ্টি জগতের কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা। অন্য কথায় এমন বিশ্বাস, কাজ, কথা বা অভ্যাসকে শিরক বলা হয়, যার দ্বারা বাহ্যত মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও গুণাবলিতে অপর কারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা প্রতীয়মান হয়।

শিরক কত প্রকার?

শিরক দুই প্রকার: ১. শিরকে আকবার (বড় শিরক) ২. শিরকে আসগার (ছোট শিরক)

১. শিরকে আকবার:

শিরকে আকবার বলা হয় এমন শিরককে, যা বান্দাকে ইসলামের মিল্লাতের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যদি তওবা না করে এবং শিরকের উপরই মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। শিরকে আকবার হলো গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া যে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদাত করা, গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা, মান্নত করা, কোন মৃত ব্যক্তি কিংবা জিন অথবা শয়তান কারো ক্ষতি করতে পারে কিংবা কাউকে অসুস্থ করতে পারে, এ ধরনের ভয় পাওয়া, প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা এবং বিপদ দূর করার ন্যায় যেসব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না– সেসব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ﴾

আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। [সূরা ইউনুস ১০: ১৮]

বর্তমান সময়েও সমাজের কিছু মূর্খ লোকেরা বলে পীরেরা আমাদের সুপারিশকারী, তাই আমরা তাদের কাছে মুরীদ হই।

২. শিরকে আসগার :

শিরক আসগার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গন্ডি থেকে বের করে দেয় না, তবে তার একত্ববাদী চেতনায় ত্রুটি ও ঘাটতির সৃষ্টি করে। এটি শিরকে আকবারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম ও কারণ। এ ধরনের শিরক দু'প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে।

প্রথমত: কথা ও কাজের ক্ষেত্রে। **দ্বিতীয়ত:** গোপন শিরক।

কথার ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ: যেমন আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কিছুর কসম বা শপথ করা। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করল, সে শিরক করল।[৩৬]

এমন কথা বলা যে, مَاشَاءَ اللهُ وَشِئْتَ অর্থাৎ আল্লাহ এবং তুমি যেমন চেয়েছ। কোন এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে "আল্লাহ এবং আপনি যেমন চেয়েছেন" কথাটি বললে তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করলে? বরং বলো, আল্লাহ এককভাবে যা চেয়েছেন।[৩৭]

---

[৩৬] মুসনাদে আহমাদ ৬০৭২, ৫৫৯৪; আবু দাউদ: ৩২৫১।

[৩৭] মুসনাদে আহমাদ ১৮৩৯, ইবনে মাজাহ: ২১১৭।

কাজের ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ:

যেমন বিপদাপদ দূর করার জন্য কড়ি কিংবা দাগা বাঁধা, বদনযর থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ লটকানো ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, এগুলো বালা-মুসীবত দূর করার মাধ্যম ও উপকরণ, তাহলে তা হবে শিরকে আসগার। কেননা আল্লাহ এগুলোকে সে উপকরণ হিসেবে সৃষ্টি করেননি। পক্ষান্তরে কারো যদি এ বিশ্বাস হয় যে, এসব বস্তু স্বয়ং বালা-মুসীবত দূর করে, তবে তা হবে শিরকে আকবার। কেননা এতে গাইরুল্লাহর প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

গোপন শিরক :

এ প্রকার শিরকের স্থান হলো ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়তের মধ্যে। যেমন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় এমন কোন কাজ করে তা দ্বারা মানুষের প্রশংসা লাভের ইচ্ছা করা। যেমন মানুষকে দেখানোর জন্য সুন্দরভাবে নামায আদায় করা কিংবা সাদাকা করা এ উদ্দেশ্যে যে- মানুষ তার প্রশংসা করবে অথবা সশব্দে যিকির-আযকার করা ও সুকণ্ঠে তিলাওয়াত করা যাতে তা শুনে লোকজন তার গুণগান করে। যদি কোন আমলে রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকে, তাহলে আল্লাহ তা বাতিল করে দেন। তিনি বলেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا﴾

কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে; আর তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে। [সূরা কাহফ ১৮: ১১০]

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ

তোমাদের উপর আমি যে জিনিসের ভয় সবচেয়ে বেশি করছি তা হলো শিরকে আসগার। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শিরকে আসগার কী? তিনি বললেন, রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা)।[৩৮]

পার্থিব লোভে পড়ে কোন আমল করাও এ প্রকার শিরকের অন্তর্গত। যেমন কোন ব্যক্তি শুধু ধনসম্পদ অর্জনের জন্যই আযান দেয় অথবা লোকদের ইমামতি করে, কিংবা শরঈ জ্ঞান অর্জন করে বা জিহাদ করে। নবী ﷺ বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ

দ্বীনার, দিরহাম এবং খামিসা, খামিলা (তথা উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ) এর দাস যারা, তাদের ধ্বংস। তাকে দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।[৩৯]

[৩৮] মুসনাদে আহমাদ: ২৩৬৭০, ২৩৬৮৬।

[৩৯] সহীহ বুখারী: ২৮৮৭, ইবনে মাজাহ: ৪১৩৬

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, সংকল্প বা নিয়তের শিরক হলো এমন এক সাগর সদৃশ যার কোন কূল-কিনারা নেই। খুব কম লোকই তা থেকে বাঁচতে পারে। নিয়ত ও সংকল্প সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা– এটাই হলো সত্যপন্থা তথা ইবরাহীমের মিল্লাত, যা অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা ব্যতীত তিনি কারো কাছ থেকে কোন কিছু কবুল করবেন না। আর এটাই হলো ইসলামের হাকীকত।

উপরের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো হলোঃ

১. কোন ব্যক্তি শিরকে আকবারে লিপ্ত হলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শিরকে আসগারের ফলে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয় না।
২. শিরকে আকবারে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে শিরকে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে না।
৩. শিরকে আকবার বান্দার সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়। কিন্তু শিরকে আসগার সব আমল নষ্ট করে না। বরং রিয়া ও দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত আমল এবং শুধু তৎসংশ্লিষ্ট আমলকেই নষ্ট করে দেয়।
৪. শিরকে আকবারে লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল মুসলিমদের জন্য হালাল। পক্ষান্তরে শিরকে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল কারো জন্য হালাল নয়।

শিরকের ভয়াবহতা

শিরক হচ্ছে সব চেয়ে বড় পাপ। যা আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করবেন না। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে মারা যায়, তাহলে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। শিরকের ভয়াবহতা এত বেশি, শিরকের ভয়াবহতা এত বেশি, শিরকের ভয়াবহতা এত বেশি যে, শিরক মানুষের সব আমল নষ্ট করে দেয় এবং মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেন না এবং তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হলো। [সূরা নিসা ৪: ৪৮]

হাদীসে এসেছে, مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهٖ دَخَلَ النَّارِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কিছু শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৪০]

---

[৪০] সহীহ মুসলিম ৯৩, সহীহ বুখারী: ১২৯।

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
স্মরণ করো, যখন লুকমান তার ছেলেকে নসীহত করে বলেছিল- হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, শিরক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট যুলুম।
[সূরা লুকমান ৩১: ১৩]

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾
নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। [সূরা মায়েদা ৫: ৭২]

আল্লাহ ﷻ তার নবী ﷺ-কে সাবধান করে বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
কিন্তু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহর) সাথে শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা যুমার ৩৯: ৬৫]

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! কত কঠিন সাবধানবাণী– নবীরাও যদি শিরক করতেন, তাহলে তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যেত। অতএব আমরা উম্মতরা কোথায় আছি! সুতরাং সাবধান, শিরক থেকে সাবধান, শিরক থেকে সাবধান! হে আল্লাহ, হে বিশ্বজগতের রব তোমার কাছে আমরা যাবতীয় শিরক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

কীভাবে শিরকের সূচনা হয়?

আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন পৃথিবীতে কীভাবে শিরকের সূচনা হয়; তবে দেখবেন এর কারণ হলো নেককার লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি। নূহ ﵇ এর সম্প্রদায় তাওহীদপন্থী ছিল। তারা এককভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করত। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করত না। সে সময় পৃথিবীর বুকে কোন শিরক ছিল না। তাদের মধ্যে ওয়াদ, সুয়া'আ, ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসর নামে পাঁচজন আল্লাহওয়ালা লোক ছিল। তাদের মৃত্যুর পর তার গোত্রের লোকেরা খুবই চিন্তিত হলো। তারা বলল, যারা আমাদেরকে ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন তারা তো চলে গেলেন। শয়তান এসে তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, তোমরা যদি তাদের ছবি তৈরি করতে মূর্তির আকৃতিতে আর তা মসজিদের কাছে রেখে দিতে তাহলে তাদেরকে দেখলেই তোমরা তোমাদের ইবাদাতে প্রাণ ফিরে পাবে। লোকেরা শয়তানের কথা শুনল এবং মূর্তি তৈরি করল। উদ্দেশ্য তাদের দেখে ইবাদাত ও নেক কাজে স্পৃহা ও উদ্দীপনা লাভ করা। এভাবে কিছুকাল পার হয়ে গেল। তাদের এ প্রজন্ম বিদায় নিল। নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ তাদের সন্তানগণ জ্ঞানবান হওয়ার পর থেকেই তারা দেখল তাদের বাপ-দাদারা এ সমস্ত মূর্তি সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলে, তাদের অনেক প্রশংসা

করে। তাদের পর আর এক প্রজন্ম দুনিয়ায় এলো। ইবলীস তাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের বাপ-দাদারা এগুলোর ইবাদাত করত, দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি বা বিপদ-আপদে তারা এগুলোর আশ্রয় কামনা করত। সুতরাং তোমরা এগুলোর ইবাদাত করো। তারা শয়তানের প্ররোচনায় নেক বান্দাদের মূর্তির ইবাদাত শুরু করল। আর এভাবেই এই পৃথিবীতে শিরকের সূচনা ঘটে। তখন আল্লাহ ﷻ তাওহীদের (আল্লাহর এককত্বের) মিশন দিয়ে নূহ عليه السلام-কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ঐ সমস্ত মূর্তির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানালেন। সাড়ে নয়শ বছর তিনি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু মাত্র অল্প ক'জন লোক দাওয়াত কবুল করল। মুশরিক জাতির নেতৃস্থানীয়রা তখন বলেছিল–

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেব-দেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুয়া'আকে, আর না ইয়াগূস, ইয়া'ঊক ও নাসরকে। [সূরা নূহ ৭১: ২৩]

নূহ عليه السلام তার জাতিকে শুধুমাত্র এক ইলাহের (আল্লাহর) ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি তাদের কোন পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেননি। অথচ তার জাতি প্রত্যুত্তরে পাঁচজন আল্লাহ-ওয়ালার নাম উল্লেখ করে বলতে চাইল– হে নূহ! এরা কি তোমার চেয়ে কম বুঝেছিল? বতর্মানেও জাতির সামনে তাওহীদের (এক আল্লাহর ইবাদাতের) দাওয়াত তুলে ধরা হলে তারা বিভিন্ন পীর-বুযুর্গদের, বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের কথা উল্লেখ করে বলে এরা কি কম বুঝে? তারা কি ভুল করেছিল?

একনজরে সমাজে প্রচলিত শিরক

১. দু'আ বা আহ্বানের ক্ষেত্রে শিরক: দু'আ বা আহ্বানের শিরক বলতে মানুষের ক্ষমতার বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা কোন পার্থিব ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা বুঝায়। যা বহুল প্রচলিত সুস্পষ্ট একটি শিরক। ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

আরো এই যে, মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না। [সূরা জিন ৭২: ১৮]

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ﴾

সত্যিকার আহ্বান-প্রার্থনা তাঁরই প্রাপ্য, যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা তাদেরকে কোন জবাব দেয় না। [সূরা রাদ ১৩: ১৪]

২. ফরিয়াদের ক্ষেত্রে শিরক: ফরিয়াদের ক্ষেত্রে শিরক বলতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকাকে বুঝায়। রোগ নিরাময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা।

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তারা (অন্যকে আল্লাহর সাথে) শরীক করে বসে। [সূরা আনকাবুত ২৯:৬৫]

৩. আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে শিরক: কোন অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যক্তি বা জিন/শয়তান হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় নেয়া বা শরণাপন্ন হওয়া বা সাহায্য চাওয়া।

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম সাজদা ৪১: ৩৬]

৪. আশা বা কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে শিরক: মানুষের অসাধ্য কোন বস্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কামনা করা। যেমন কোন পীরের কাছে সন্তান বা ধনসম্পদ ইত্যাদি কামনা করা।

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। [সূরা শুআরা ৪২: ৪৯]

৫. সালাতের (নামাযের) ক্ষেত্রে শিরক: সালাতের ক্ষেত্রে শিরক বলতে রুকূ, সিজদা, সওয়াবের আশায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে বিনম্রভাবে দাঁড়ানো ইত্যাদি এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আদায় করাকে বুঝানো হয়।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ করো, সিজদা করো এবং তোমাদের রবের ইবাদাত করো ও সৎ কাজ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা হজ্জ ২২: ৭৭]

৬. তাওয়াফের ক্ষেত্রে শিরক: কাবা ঘর ব্যতীত অন্য কোন ঘর বা বস্তুর তাওয়াফ করা।

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

এবং স্মরণ করো যখন আমি কাবা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।

[সূরা বাকারা ২: ১২৫]

৭. তাওবার শিরক : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে তাওবা করা।

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা নূর ২৪: ৩১]

৮. যবেহের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য পশু যবেহ করা। চাই তা আল্লাহর নামেই করা হোক বা অন্য কারো নামে বা নবী বা জিনের নামে।

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

তুমি বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। [সূরা আনআম ৬: ১৬২]

৯. মান্নতের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত করা শিরক।

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

তোমরা যা ব্যয় কর কিংবা যা কিছু **মান্নত** কর, আল্লাহ নিশ্চয় তা জানেন; কিন্তু যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা বাকারা ২: ২৭০]

১০. আনুগত্যের শিরক: বিনা ভাবনায়/দলীলে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ ছাড়াই হালাল-হারাম জায়েয-নাজায়েযের ব্যাপারে আলেম[৪১]-বুযুর্গ বা উপরস্থ কারো সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম আর দরবেশদেরকে[৪২] রব বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা তাওবা ৯: ৩১]

খ্রিস্টানরা তাদের আলেমদের উপাসনা করত না; তবে তারা হালাল হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে তাদের আলেমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিত। আর এটিই হচ্ছে শিরক।

১১. ভালবাসার শিরক: দুনিয়ার কাউকে এমনভাবে ভালবাসা যাতে তাঁর আদেশ-নিষেধকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের উপর প্রাধান্য দেয়া অথবা সমপর্যায়ের মনে করা। প্রকৃতিগত ভালবাসা (খাবার), স্নেহ জাতীয় ভালবাসা (সন্তানের জন্য পিতামাতার), আসক্তিগত ভালবাসা (স্বামীর জন্য স্ত্রীর) ইত্যাদির কোনটাকেই আল্লাহর ভালবাসার উপর স্থান দেয়া যাবে না।

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾

আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালবাসার মতো তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু

---

[৪১] যেসব আলেম কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলে তাদের অনুসরণ করতে কোন সমস্যা নেই।

[৪২] এ আয়াতে أحبار (আহবার) দ্বারা ইয়াহুদীদের ধর্মপন্ডিত আর رهبان (রুহবান) দ্বারা নাসারাদের ধর্মপন্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যারা মুমিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ় এবং কী উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। [সূরা বাকারা ২: ১৬৫]

১২. ভয়ের শিরক: ভয়ের শিরক বলতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রকাশ্যভাবে দুনিয়া বা আখিরাত সংক্রান্ত যে কোন ক্ষতি সংঘটন করতে পারে বলে বিশ্বাস করে তাকে ভয় পাওয়াকে বুঝানো হয়। মানুষ, মূর্তি, জিন ইত্যাদির অনিষ্টতা থেকে ভয় পাওয়া শিরক। প্রভাবশালী শাসকের ভয়ে ভাল কাজ বা জিহাদ হতে দূরে থাকা ছোট শিরক। তবে শত্রুর ভয়, বাঘের ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক ভয় শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

﴿وَحَاجَّهُۥ قَوۡمُهُۥۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنِۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشۡرِكُونَ بِهِۦٓ﴾

তার জাতি তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ করছ অথচ তিনি আমাকে সৎপথ দেখিয়েছেন। তোমরা যাদেরকে তার অংশীদার স্থির কর আমি তাদেরকে ভয় করি না। [সূরা আনআম ৬: ৮০]

১৩. ভরসার শিরক : মানুষের অসাধ্য ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা করা। কারো সমস্যা দূরীকরণ, চাকরি লাভ, রোগমুক্তি ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে।

﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيۡهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمۡ غَٰلِبُونَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾

সেই দুই ব্যক্তি (যারা আল্লাহকে ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা) বললঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করো, যদি তোমরা মুমিন হও। [সূরা মায়েদা ৫: ২৩]

১৪. সুপারিশের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে পরকালের মুক্তির জন্য সুপারিশ কামনা[৮০] করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾

বলো, শাফা'আত সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। [সূরা যুমার ৩৯: ৪৪]

১৫. হেদায়াতের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কাউকে হেদায়াত করতে পারে এমন বিশ্বাস করা অথবা কারো নিকট হেদায়াত কামনা করা শিরক।

﴿لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ﴾

---

[৮০] আল্লাহর অনুমতিক্রমে পরকালে হাশরের মাঠে নবী-রাসুলগন, শহীদগণ, নেকবান্দাগণ শাফা'আত করবেন তাদের জন্য যাদের উপর স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট/খুশি।

তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করে থাক এবং যা কিছু তোমরা মাল হতে ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার ফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। [সূরা বাকারা ২: ২৭২]

১৬. সাহায্য প্রার্থনার শিরক: গায়েবি সাহায্য বা মানুষের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট কামনা করা। ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾ আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। [সূরা ফাতিহা ১: ৫]

১৭. কবরের শিরক: কবরে শায়িত কারো জন্য ইবাদাত করা। অর্থাৎ সেখানে সালাত আদায় করা, সিজদা করা, তার নিকট কিছু চাওয়া, তার (ওসীলার) মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে কিছু চাওয়া, সেখানে মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا﴾

আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেব-দেবীদের কক্ষনো পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুয়া'আকে, আর না ইয়াগূস, ইয়া'ঊক ও নাসরকে। [সূরা নূহ ৭১: ২৩]

১৮. আল্লাহর **অবস্থান সম্পর্কিত শিরক:** আল্লাহ মুমিনের অন্তরে বিরাজমান মনে করা, আল্লাহ সবার অন্তরে বিরাজমান মনে করা, আল্লাহ সকল বস্তুর মাঝে মিশ্রিত বা মিশে আছেন বা লুকায়িত আছেন মনে করা ইত্যাদি ধারণা এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ﴾

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। [সূরা আরাফ ৭: ৫৪]

১৯. দেখা ও শোনার শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মানুষ (হোক তিনি নবী বা রাসূল) সব শুনতে বা দেখতে পান এমন মনে করা শিরক।

﴿قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ﴾

তিনি (আল্লাহ ﷻ) বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি, আমি (সব কিছু) শুনি ও দেখি। [সূরা ত-হা ২০: ৪৬]

২০. কিয়ামত সম্পর্কিত শিরক: কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন নবী-রাসূল ﷺ, পীর, ওলী, ইত্যাদি মানুষরা অন্যান্য মানুষদেরকে আল্লাহর আযাব[৪৪]

[৪৪] আল্লাহর অনুমতিক্রমে পরকালে হাশরের মাঠে নবী-রাসুলগন, শহীদগণ, নেকবান্দাগন শাফা'আত করবেন তাদের জন্য যাদের উপর স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট/খুশি।

হতে বাঁচাতে পারবে মনে করা শিরক। এছাড়া কেউ কোন মানুষকে আল্লাহর আযাব হতে রেহাই দিতে পারবে এমনটা মনে করাও শিরক।

﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوْحٍ وَّامْرَأَتَ لُوْطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ﴾

যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ নূহের স্ত্রী আর লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। এরা ছিল আমার দু'নেককার বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা দু'জনই তাদের স্বামীদ্বয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না। তাদেরকে বলা হলো, তোমরা দু'জন জাহান্নামে প্রবেশ করো (অন্যান্য) প্রবেশকারীদের সঙ্গে। [সূরা তাহরীম ৬৬ : ১০]

২১. গায়েব সম্পর্কিত শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মানুষ হোক নবী-রাসূল ﷺ, হুজুর/কেবলা/পীর/বুযুর্গ– গায়েব জানেন এমনটা বিশ্বাস করা শিরক।

﴿قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾

বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে। [সূরা নামল ২৭: ৬৫]

২২. আল্লাহ **ছাড়া অন্য কেউ মানুষের মনের কথা জানে বলে বিশ্বাস করা শিরক।**

﴿وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾

তোমরা তোমাদের কথা চুপেচাপেই বল আর উচ্চৈঃস্বরেই বল, তিনি (মানুষের) অন্তরের গোপন কথা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন না? তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, ওয়াকিফহাল। [সূরা মুলক ৬৭: ১৩-১৪]

২৩. আল্লাহ **ছাড়া অন্য কেউ সন্তানসন্ততি দিতে পারে– এমন বিশ্বাস করা শিরক।**

﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [সূরা শূরা ৪২: ৪৯-৫০]

২৪. আল্লাহ **ছাড়া অন্য কেউ সুস্থতা দান করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক।**

﴿وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ - وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ﴾

আর (ইবরাহীম ﷺ বললেন) আমি যখন পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় আমাকে জীবিত করবেন। [সূরা শুআরা ২৬: ৮০-৮১]

২৫. আল্লাহর **ইচ্ছা ছাড়া কেউ ইচ্ছা করলেই কোন ভাল কাজ করতে পারে বা কোন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে এমন মনে করা শিরক।**

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ﴾

সে বলল, হে আমার কাওম! আচ্ছা বলো তো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে একটি উত্তম সম্পদ (নবুওয়াত) দান করেন, তাহলে আমি কী রূপে প্রচার না করে পারি? আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। [সূরা হূদ ১১: ৮৮]

২৬. আল্লাহর **ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে এমনটা মনে করা শিরক।**

﴿سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾

(যুদ্ধ থেকে) পিছ-পড়া বেদুঈনরা তোমাকে বলবে- আমাদের মালধন আর আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, কাজেই (হে নবী) আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। (তাদেরকে) বলো, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা কোন কল্যাণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর বিপক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা কার আছে? (কারো কোন ওকালতির দরকার নেই) বরং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহই খবর রাখেন। [সূরা ফাতহ ৪৮: ১১]

২৭. আল্লাহর **ইচ্ছা ছাড়া কেউ কাউকে বাঁচাতে বা মারতে পারে মনে করা শিরক।**

﴿هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾

তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন, তার জন্য তিনি বলেন- হও, তখনই তা হয়ে যায়। [সূরা মুমিন ৪০: ৬৮]

২৮. কোন নবী-রাসূল عليه السلام **গাউস, কুতুব, ওলী/বুযুর্গ/দরবেশ বিশ্ব পরিচালনায় অংশ নেন এরকম বিশ্বাস করা শিরক।**

﴿اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ﴾

আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলীকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন, যা তোমরা দেখছ; অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের বন্ধনে

বশীভূত রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গতিশীল আছে। যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন- যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পার। [সূরা রাদ ১৩: ২]

২৯. একমাত্র আল্লাহই **কারো** অন্তরের **পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এর ব্যতিক্রম বিশ্বাস করা শিরক।**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে; আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। আর তোমাদেরকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে। [সূরা আনফাল ৮: ২৪]

৩০. যাদু-টোনা করা শিরক এবং কুফরঃ যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত। মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত (হারুত) ও মারূতের (মারুতের) উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাত না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী করো না। এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত। মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না। বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না। আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘণ্য, যদি তারা জানত। [সূরা বাকারা ২: ১০২]

৩১. সওয়াবের উদ্দেশ্যে মসজিদ ছাড়া অন্য কোন জায়গায় (যেমন কোন মাযার বা পীরের খানকায়) **সফর করা বা খাদেম হওয়া শিরকের** অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

এবং স্মরণ করো যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।

[সূরা বাকারা ২: ১২৫]

৩২. আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির ওসীলা গ্রহণ: আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার জন্য কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ/নেককার ব্যক্তিকে ওসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা শিরক।

৩৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে জীবনবিধান প্রণেতা মনে করা: আল্লাহই একমাত্র মানব জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য আইন বিধানের অধিকার রাখেন। এ কাজের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেউ নন। কোন ব্যক্তি, শক্তি, প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন অথবা কোন দল যদি আল্লাহর দেয়া বিধানের হালালকে হারাম করে আর হারামকে হালাল করে তাহলে তা মেনে নেয়া শিরক।

৩৪. মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা, এমনিভাবে প্রথা ও চিরাচরিত অভ্যাস দ্বারা ফায়সালা করা।

৩৫. সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, পীরতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, নাস্তিক্যবাদ, মানবধর্মবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমর্থন ও বিশ্বাস করা: যদি কোন ব্যক্তি মনে করে বর্তমান যুগে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চলে না এবং তা সেকেলে বা অচল এবং গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পীরতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ-মতবাদ, নাস্তিক্যবাদ, মানবধর্মবাদ, ইত্যাদিই হলো যুগোপযোগী পদ্ধতি- তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।[৪৫]

৩৬. কুরআনের বিকৃতি ঘটেছে এমন ধারণা করা।

৩৭. তথাকথিত ন্যাংটা বাবা ভবিষ্যৎ বা গায়েব জানে বা ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। এরূপ বিশ্বাস করা শিরক।

৩৮. গাইরুল্লাহর নামে কসম করা: মূলত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করা শিরক। যেমন: রাসূলুল্লাহর কসম, কাবা ঘরের কসম, নিজ চোখের কসম, বাবা-মায়ের কসম, বিদ্যা বা বইয়ের কসম ইত্যাদি।

৩৯. ছবি-মূর্তি: কোন নেতা, লিডার বা স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা ইত্যাদি এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪০. সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার : সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ, এগুলোকে সম্মান জানানো, সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি শিরক।

৪১. অগ্নিপূজা, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ : 'অগ্নিশিখা' অগ্নিপূজকদের ইলাহ/উপাস্য বা দেবতা। তারা ভক্তি, প্রণাম ও নানা কর্মকান্ডের দ্বারা আগুনের পূজা

---

[৪৫] বায়হাকি ২৬১, ২০৩৫০, তিরমিযী: ৩০৯৫।

করে থাকে। এ অগ্নিপূজা সম্পূর্ণ শিরক ও আল্লাহদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনির্বাণের' নামে অগ্নিমশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো এবং এগুলোর প্রজ্জ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর উপর এগুলো স্থাপন করা, অলিম্পিক মশালসহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলনও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪২. মঙ্গল প্রদীপ : হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।

৪৩. পীরের ধ্যান : পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মুরাকাবা, ধ্যান, যিকির বা অন্য যে কোন ইবাদাত করা শিরক।

৪৪. গাইরুল্লাহর নামে যিকির বা ওযীফা : আল্লাহর যিকিরের ন্যায় কোন নবী বা রাসূল, পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গ, আলিমের নাম জপ করা, বিপদে পড়লে তাদের নামের ওযীফা পড়া। যেমন- ইয়া রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নূরে রাসূল, নূরে খোদা, হক বাবা, ইয়া বড়-পীর আব্দুল কাদির জিলানী, ইয়া গাউসুল আযম, ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া হাসান ইত্যাদি।

৪৫. আল্লাহ **যা করান, তাই করি :** একদল পীরেরা বলে, আল্লাহ যা করান, তাই করি। আল্লাহ সালাত আদায় করান না, তাই আদায় করি না; আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছেন, তাই টানি; তাকদীরে সালাত থাকলে তো আদায় করব ইত্যাদি এসব কথা বলা শিরক ও কুফরী।

৪৬. সীনায় সীনায় মারেফতি : ভন্ডপীর বা দরবেশ দাবিদার একদল লোক বলে থাকে, কুরআন মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় যাহেরি (প্রকাশ্য) ইলম আছে। বাকি ১০ পারা মারেফতি ইলমে ভরা রয়েছে। এ ১০ পারা আমরা সীনায় পেয়েছি। শরীয়তের মোল্লারা এগুলোর খবর রাখেন না।

৪৭. শরীয়তের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরয নয় : অনেকের ধারণা, মারেফতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেলে তখন তার জন্য শরীয়তের হুকুম-আহকাম, সালাত, সাওম ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়।

৪৮. শিরকের গন্ধযুক্ত উপাধি : তথাকথিত সমাজে প্রচলিত ভন্ডপীর-ফকির বা ওলীকে এমন কোন উপাধিতে সম্বোধন করা, যা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। যেমন- গাউসুল আযম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নেওয়ায (গরিবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কুশা (যার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়), কাইয়ূমে যামানা (যামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি।

৪৯. সন্তানের **নামকরণে নবী-রাসূল** عليهم السلام **ও পীর-আওলিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন :** গোলাম মোস্তফা (মোস্তফার গোলাম), আবদু নবী (নবীর দাস), আবদুর রাসূল (রাসূলের দাস), আলী বখশ (আলীর দান), হুসাইন বখশ (হুসাইনের দান), পীর বখশ (পীরের দান), মাদার ('মাদার'-কে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের হিন্দুরা বড় ঋষি বলে জানে) বখশ (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন

(মহিউদ্দীনের গোলাম), আবদুল হাসান (হাসানের গোলাম), আবদুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম) ইত্যাদি নাম রাখা শিরক।

৫০. মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন : সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথড (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জনে বিশ্বাস করা শিরক।

৫১. গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস : অনেকের ধারণা মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলা হয়, এ ব্যক্তির উপর শনি গ্রহের প্রভাব পড়েছে বা রাহুগ্রাস হয়েছে। কারো আনন্দের খবর শুনলে বলা হয়ে থাকে, এ ব্যক্তি মঙ্গল গ্রহের সু-নযরে আছে।

৫২. বাতাস, রোদ বা বৃষ্টিকে গালি দেয়া : অনেক মানুষ না বুঝে বাতাস, রোদ বা বৃষ্টিকে গালি দেয়। বাতাস, রোদ বা বৃষ্টিকে গালি দেয়া নিষেধ। কেননা স্বয়ং আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা বাতাস, রোদ বা বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। তাই বাতাস, রোদ বা বৃষ্টিকে গালি দিলে প্রকৃতপক্ষে তা বাতাস, রোদ বা বৃষ্টির নিয়ন্ত্রকের উপরই বর্তায়। তাই বাতাস, রোদ বা বৃষ্টিকে গালি দেয়া হারাম ও শিরকী কাজ।

৫৩. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব : অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এসবই স্রেফ শিরকী ধারণা।

৫৪. ওরশ : অনেক মাযারে ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যু তারিখ নির্দিষ্ট করে ওরশ হয়ে থাকে। সেখানেও অনেক ধরনের শিরকী কর্ম হয়ে থাকে। যেমন পীরদের সেজদা করে মুরীদরা। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে যিকির করে, কাওয়ালি গান শুনে। ভন্ড পীর, ফকিররা এসব ওরশে ওয়ায নসীহতের নামে ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারক রান্না করা হয়। ওরশের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। বাস্তবিক অর্থে ওরশ হচ্ছে আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের একটা সহজ পন্থা (বিনা পুঁজির ব্যবসা)।

৫৫. খাজা বাবার ডেগ : একদল লোক বিশেষত যুবকরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। কাপড় বিছিয়ে, বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলি বাতি জ্বালিয়ে, বিভিন্ন কালারের কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'। এটাও একটা বিনা পুঁজির ব্যবসা। এতে টাকা দেয়া হারাম ও মারাত্মক গুনাহের কাজ।

আসুন, ঈমানী দায়িত্ব পালন করি:

- নবী-রাসূল عليهم السلام ও ওলীদেরকে মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ না করি।
- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশের জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মনে না করি। কোন ভাস্কর্য, মূর্তি, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধকে সম্মান প্রদর্শনের

জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে না থাকি। গণতন্ত্র, পীরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদকে না বলি ও প্রত্যাখ্যান করি।

- মাযার ও কবরে নযর/মান্নত না করি। মাযার ও কবরে গিয়ে মাযার ও কবর মুখী হয়ে দু'আ ও সালাত/নামায না পড়ি। হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ আমলে আনার চেষ্টা করি।

শিরক সম্পর্কে সহজ কথা:

- আল্লাহর উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত, উবূদিয়্যাত, আসমা ওয়াস-সিফাতের সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তিকে অংশীদার মনে করাই হচ্ছে শিরক।
- শিরক সমস্ত নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। শিরকের পাপের কোন ক্ষমা নেই। শিরকের পরিণতি ধ্বংস। মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ। শিরক মিশ্রিত ঈমান কখনই ঈমান হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
- জীবন বিপন্ন হলেও শিরক করা যাবে না। সুতরাং শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আল্লাহর নিকটে প্রাণ খুলে দু'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল ﷺ শিরক হতে বাঁচার জন্য আমাদেরকে দু'আ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না না'ঊযুবিকা আন-নুশরিকা শাইআন না'লামুহ, ওয়া নাসতাগফিরুকা লিমা লা না'লামুহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! জেনে-বুঝে শিরক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অজ্ঞাত শিরক থেকেও আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি।[৪৬] আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক হতে রক্ষা করুন। আমীন।

জাহেলী যুগে প্রচলিত কর্মের সাথে বাংলাদেশের মুসলিমদের কর্মের তুলনামূলক আলোচনা

জাহেলী যুগের মানুষের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের সাথে বর্তমান বাংলাদেশের মুসলিমদের কী পরিমাণ মিল বা অমিল রয়েছে, তা সর্ব সাধারণের নিকট যেন সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়, সেজন্য নিম্নে উভয় সময়ের শিরকী কর্মকান্ডের একটি তুলনামূলক বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১. জাহেলী যুগের লোকেরা কাহিন বা গণকদের দ্বারা ভাগ্য জানার চেষ্টা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম গণক, টিয়া পাখি ও বানরের মাধ্যমে ভাগ্য জানার চেষ্টা করে।

---

[৪৬] মুসনাদে আহমাদ: ১৯৬০৬, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ২৯৫৪৭।

২. জাহেলী যুগের লোকেরা আররাফ বা ভবিষ্যদ্বাণীকারকদের গায়েব সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম জিন সাধকদের গায়েব সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস করে। তারা আরো মনে করে যে, নবী ও ওলীগণ গায়েব জানেন।

৩. জাহেলী যুগের লোকেরা পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গল জানার চেষ্টা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম টিয়া পাখি ও বানরের সাহায্যে ভাগ্য জানার চেষ্টা করে।

৪. জাহেলী যুগের লোকেরা ওয়াদ, সুয়া'আ, ইয়াগুস ইত্যাদি নামে নির্মিত মূর্তিসমূহ প্রয়োজন পূরণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করত। আর বর্তমান সময়ের মুসলিমরা ওলীগণ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করে।

৫. জাহেলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, দেবতারা ইহকালীন কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূর করতে পারে। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের মধ্যকার গাউছ ও কুতুবগণ দুনিয়া পরিচালনা করেন এবং মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করে।

৬. জাহেলী যুগের লোকেরা ওলী ও ফেরেশতাদের নামে নির্মিত মূর্তি ও দেবতাসমূহ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য শাফাআত করতে পারে বলে বিশ্বাস করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীগণ নিজস্ব মর্যাদায় আল্লাহর কোন পূর্বানুমতি ব্যতীত তাদের ভক্তদের জন্য শাফাআত করে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করে।

৭. জাহেলী যুগের লোকেরা মালাইকা/ফেরেশতা ও ওলীদের নামে নির্মিত দেবতাদের/উপাস্যদের সাধারণ মানুষদের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়ার ওসীলা/মাধ্যম হিসেবে মনে করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম মৃত ওলীদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়ার ওসীলা/মাধ্যম মনে করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, মৃত ওলীগণ ভক্তদের সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

৮. জাহেলী যুগের লোকেরা উয্যা ও যাতে আনওয়াত নামের গাছ সর্বস্ব দেবতা যুদ্ধে বরকত ও বিজয় এনে দিত বলে বিশ্বাস করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের কবরের/মাজারের উপর অথবা পার্শ্ববর্তী স্থানে উৎপন্ন বা লাগানো গাছের শিকড়, ফল ও পাতার মাধ্যমে বরকত ও বিবিধ কল্যাণ লাভ করা যায় বলে মনে করে। তারা কবরের/মাজারের পুকুর ও কূপের পানি পান করে এবং মাছ, কচ্ছপ ও কুমীরকে খাবার দিয়ে রোগ মুক্তি ও বরকত কামনা করে।

৯. জাহেলী যুগের লোকেরা উপত্যকার জিন সর্দারের নিকট আশ্রয় কামনা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম কাঠ ও মধু সংগ্রহকারীদের দ্বারা জঙ্গলের জিন ও হিংস্র প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য জঙ্গলের জিন সর্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বিল ও জলাশয়ের মাছ ধরার জন্য পানি সেচের পূর্বে 'কাল' নামক জিনকে শিরনী দিয়ে সন্তুষ্ট করে।

১০. জাহেলী যুগের লোকেরা পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহের উপর তারকা ও নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম মানুষের ভাগ্যের উপর গ্রহ ও তারকার প্রভাবে বিশ্বাস করে।

১১. জাহেলী যুগের লোকেরা গোত্রীয় নেতাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী গোত্র শাসন করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম মানবরচিত বিধানের আলোকে দেশ শাসন করে। আল্লাহর পরিবর্তে দেশের জনগণকে ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমে সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনে করে।

১২. জাহেলী যুগের লোকেরা দাদ ও প্লেগ রোগকে নিজ থেকে সংক্রামক রোগ বলে বিশ্বাস করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম কলেরা, বসন্ত, দাদ, এজমা, যক্ষা, প্লেগ ও এইডস রোগকে নিজ থেকে সংক্রামক রোগ বলে মনে করে।

১৩. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতাদের দিকে মুখ করে দু'আ করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম দু'আ গৃহীত হওয়ার জন্য মুরশিদ, পীর ও ওলীদের কবরের/মাজারের দিকে মুখ করে দু'আ করে।

১৪. জাহেলী যুগের লোকেরা, ছোট ছোট ব্যাপারে দেবতারা সাহায্য করতে পারে- এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের নিকট তা কামনা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম মৃত ওলীগণ সাহায্য করতে পারেন মনে করে তাদের নিকট সাহায্য চায়।

১৫. জাহেলী যুগের লোকেরা ওলীদের মূর্তির সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়াত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের কবর ও পীরের সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়ায়।

১৬. জাহেলী যুগের লোকেরা ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় মূর্তির নিকট সাহায্য চাইত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের নিকট সাহায্য কামনা করে।

১৭. জাহেলী যুগের লোকেরা ওয়াদ, সুয়া'আ ইত্যাদি ওলীগণের প্রথমত কবর এবং পরে তাদের মূর্তির সামনে অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহর উপাসনায় মনোযোগ দিত ও তার নিকটবর্তী হতে চাইত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের কবরে অবস্থান গ্রহণ করে তাদের বাতেনী ফয়েয হাসিল করতে চায় এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চায়।

১৮. জাহেলী যুগের লোকেরা চাঁদ ও সূর্যকে সেজদা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম পীর/ওলীদের কবরে/মাজারে সেজদা করে।

১৯. জাহেলী যুগের লোকেরা বিপদাপদ দূর করার জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে নযর-নিয়াজ ও মান্নত করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ওলীদের কবরে মান্নত করে।

২০. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতাদেরকে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম আল্লাহর হুকুমের উপরে পীরের হুকুমকে প্রাধান্য দেয়।

২১. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতাদের নিকট প্রয়োজন পেশ করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের নিকট প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করে।

২২. জাহেলী যুগের লোকেরা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দেবতাদের উপর ভরসা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ওলীদের উপর ভরসা করে।

২৩. জাহেলী যুগের লোকেরা ধর্ম যাজকদেরকে হারাম ও হালাল নির্ধারণকারী বানিয়ে নিত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের উপর পীর ও নিজস্ব মাযহাবের মতামতকে প্রাধান্য দেয়।

২৪. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতাদের সাথে সম্পর্কিত কথিত বরকতপূর্ণ স্থান সমূহ যিয়ারত করতে যেত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের কবর ও তাঁদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহ দূর-দূরান্ত থেকে যিয়ারত করতে যায়।

২৫. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতাদের মূর্তির গায়ে হাত বুলিয়ে বরকত হাসিল করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম ওলীদের কবর/মাজার, কবরের দেয়াল, গিলাফ ও তাদের স্মৃতিসমূহ স্পর্শ করে বরকত হাসিল করে।

২৬. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতা ও বাপ-দাদার নামে শপথ গ্রহণ করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম আগুন, পানি, মাটি, বিদ্যা ইত্যাদির নামে শপথ করে।

২৭. জাহেলী যুগের লোকেরা দেবতাদের নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানাদির নাম রাখত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম কোন ওলীর নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানাদির নাম রাখে।

২৮. জাহেলী যুগের লোকেরা বরকত হাসিলের জন্য সন্তানদেরকে দেবতাদের কাছে নিয়ে যেত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম বরকত লাভ ও রোগ মুক্তির জন্য সন্তানদেরকে ওলীদের কবরে নিয়ে যায়।

২৯. জাহেলী যুগের লোকেরা শিরকী পন্থায় অসুখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করে।

৩০. জাহেলী যুগের লোকেরা চোখের কুদৃষ্টি থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য গলায় ঝিনুক থেকে আহরিত মালা পরাত। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম কারো চোখ লাগা থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য তাদের গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে।

উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের মুশরিকদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের সাথে আমাদের দেশের অনেক মুসলিমদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাদের মধ্যে এমনও অনেক শিরকী কর্ম রয়েছে যা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মধ্যে ছিল না। জাহেলী যুগের লোকেরা নৌকা যোগে কোথাও যাওয়ার প্রাক্কালে ঝড় ও তুফানের কবলে পতিত হলে তারা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকেই স্মরণ করে তাঁকে আহ্বান করত বলে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে। [সূরা ইউনুস ১০:২২] অথচ দেখা যায়, বর্তমানে অনেক মুসলিম রয়েছে যারা অনুরূপ বিপদে পতিত হলে সাহায্যের জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বান না করে ওলীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের মানুষেরা যতটুকু শয়তানের শিকারে পরিণত হয়েছিল আমাদের দেশের অনেক মুসলিমরা এর চেয়েও অধিক শিকারে পরিণত হয়েছে।[৪৭]

[৪৭] শিরক কী ও কেন? ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী। ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৯-২৭২ (ঈষৎ পরিমার্জিত)

তৃতীয় অধ্যায়

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ এর ব্যাখ্যা:

[এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল]

এই শাহাদাহ বা সাক্ষ্য প্রদানের দাবি ও চাহিদা হলো–

- রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু আদেশ করেছেন তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে চলা।
- পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করা।
- তাঁর দেয়া যাবতীয় বার্তা-সংবাদকে নির্দ্বিধায়-নিঃসন্দেহে সত্য বলে বিশ্বাস করা।
- তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।
- তাঁর দেখানো তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করা। শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু যোগ বা সংযোজন না করা এবং নিজের মনগড়া পন্থায় আল্লাহর ইবাদাত না করা।

আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী রহ. তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

মুহাম্মাদ ﷺ আলস্নাহর বান্দা ও রাসূল এ কথা মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে নিচের বিষয়গুলো মেনে নেয়া:

- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ সংবাদ বাহক এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়োজিত বিশ্বমানবের একচ্ছত্র নেতা বলে স্বীকার করবে।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে মানব জাতির অনুসরণীয়, উৎকৃষ্টতম ও সত্য বিধান সহকারে প্রেরিত, এই বিধানকে কর্মজীবনে বাস্তব রূপ প্রদান করার দায়িত্বসহ নিয়োজিত মহামানব ও আল্লাহর সংবাদ-বাহক বলে জানবে।
- ✓ তাকে পরম সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ এবং পাপমুক্ত বলে বিশ্বাস করবে।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ-কে স্বীয় প্রাণ, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু-বান্ধব এবং স্বীয় সম্মান ও সম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং তার জীবনের ন্যায় তার মৃত্যুতেও তাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাস্পদ ও মহামাননীয় রূপে জানবে।
- ✓ ফেরেশতা, ওহী বা প্রত্যাদেশ; বিচার-দিবস, জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহর দর্শন লাভ এবং আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসে যা কিছু অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে স্বীকার করবে।
- ✓ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্য কাউকে নবী-রাসূল ও আল্লাহর প্রত্যাদেশবাহী বলে স্বীকার করবে না।

- ✓ যে মতবাদ ও বিশ্বাস পবিত্র আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় তা স্বীকার করে নিবে এবং যা বিপরীত তা নির্ভয়ে অস্বীকার করবে।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ যে বিধান মানব জাতির হাতে প্রদান করেছেন তার সমগ্র অংশকে আল্লাহর নির্দেশিত বলে জানবে, কোন অংশকে তার স্বরচিত বলে ধারণা করবে না।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রচারিত শিক্ষা ও কার্যক্রমকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সব প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ঠ, কার্যকরী ও সুরক্ষিত বলে জানবে।
- ✓ কোন নির্দেশ মান্য করার পক্ষে শুধু এটিই যথেষ্ট হবে যে, উক্ত আদেশ বা নিষেধ মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত বলে প্রমাণিত কি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ পালনে কারো অনুমতির প্রয়োজন হবে না।
- ✓ মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত বিধানের কোন অংশের পরিবর্তন, বা সংশোধন করার অধিকার কোন ব্যক্তি, দল বা গভর্নমেন্টের আছে বলে বিশ্বাস করবে না।
- ✓ যেসকল বিচারালয়ের বিচারকার্য মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত আইনের (আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ) অনুসারে পরিচালিত হয় না, সেগুলিকে বিচার কাজের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া জানিবে না।[৪৮]

"মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল" এই সাক্ষ্যবাণীর মর্মকথা হলোঃ

১. মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনা। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর রাসূলের নিকট তিনি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেই কিতাবের এবং পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আনো। [সূরা নিসা ৪: ১৩৬]

২. একমাত্র রাসূলকেই উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। [সূরা আহযাব ৩৩: ২১]

৩. সর্বদা তাঁকে সম্মান করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا﴾

(ওহে মানুষেরা) যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, রাসূলকে শক্তি যোগাও আর তাকে সম্মান কর, আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর। [সূরা ফাতহ ৪৮: ৯]

---

[৪৮] কালিমা তাইয়েবা, পৃ: ১০৫-১০৯।

৪. পৃথিবীর সবকিছু থেকে এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাঁকে বেশি ভালবাসা। হাদীসে এসেছে,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হতে অধিকতর প্রিয় হব।[৪৯]

৫. তাঁর প্রতি সালাম জানানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। [সূরা আহযাব ৩৩: ৫৬]

৬. দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল। [সূরা আহযাব ৩৩: ৩৬]

৭. কোন অবস্থাতেই তাঁর খিয়ানত না করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর যে বিষয়ে তোমরা আমানত প্রাপ্ত হয়েছ তাতেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। [সূরা আনফাল ৮: ২৭]

৮. তাঁর আদেশ অমান্য না করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

ওহে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না। [সূরা আনফাল ৮: ২০]

৯. তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। [সূরা নিসা ৪: ১৪]

---

[৪৯] সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৭, সহীহ বুখারী: ১৫, মুসলিম: ৪৪ ।

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

তোমরা আমার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করো না, যেমনভাবে নাসারা/খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো একজন বান্দা বৈ আর কিছুই নই। তাই তোমরা বলো, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[৫০]

১১. মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে না, এর স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ۗ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী[৫১]। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাত। [সূরা আহযাব ৩৩: ৪০]

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল- এ কথার অর্থ এই নয় যে, রাসূল ﷺ মানুষের ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখেন। এরূপ কোন ধারণা বা বিশ্বাস মোটেই করা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একনিষ্ঠ অনুসরণ করা, তাঁকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ (মডেল) হিসেবে মেনে নেয়া, তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা, তাঁর দেয়া নির্দেশাবলি মেনে চলা, তাঁর আদেশ অমান্য না করা, তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা এবং তাঁকে সর্বশেষ নবী হিসেবে মেনে নেয়া। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা বা দাস এ সাক্ষ্যের দাবি হলো, সৃষ্টি বা পরিচালনায় এবং প্রভুত্বে কিংবা ইবাদাতে রাসূল ﷺ এর কোন অধিকার নেই। বরং তিনি নিজেই আল্লাহর ইবাদাতকারী। তিনি সত্য রাসূল। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। তিনি নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোন ক্ষমতা রাখেন না। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তাঁর প্রতি যা আদেশ করা হয় তিনি কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করে থাকেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿قُلْ لَّآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى إِلَيَّ﴾

বলো, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে, আর আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না। আর আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয় তাছাড়া (অন্য কিছুর) আমি অনুসরণ করি না। [সূরা আনআম ৬: ৫০]

তবে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আসীন করেছেন। তাঁকে দিয়েছিলেন এমন কিছু স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য, যা পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

[৫০] সহিহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৯, সহীহ বুখারী: ৩৪৪৫, মুসনাদে আহমাদ: ১৫৪।

[৫১] মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী; তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না- এ বিষয়টি আল কুরআনের এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ

আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে অন্যান্য নবীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১) অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা।

২) শত্রুপক্ষের অন্তরে আমার ভয়।

৩) আমার জন্য গনীমতের সম্পদ বৈধ।

৪) সব জমিন (মাটি) আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যম।

৫) আমাকে সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

৬) আমার দ্বারা নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।[৫২]

নবী ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ যে সম্মান দান করেছেন, তাতে অধিষ্ঠিত করাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মর্যাদাবান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সীমাহীন শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

সুন্নাহ কী?

শরঈ পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী, কাজ, মৌনসম্মতি, যাবতীয় ইবাদাত, আদেশ-নিষেধ, সবকিছুই হচ্ছে সুন্নাহ। সুন্নাহ [اَلسُّنَّةُ] শব্দটি سَنَّ يَسُنُّ ক্রিয়ামূল থেকে। যার অর্থ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়ই হতে পারে। যেমন- اَلسُّنَّةُ مِنَ اللهِ (আল্লাহর নীতি)। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا﴾

তোমার পূর্বে আমি আমার যে সব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল নিয়ম আর তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না। [সূরা ইসরা ১৭: ৭৭]

রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট রীতি চালু করল, অতঃপর তার অবর্তমানে সেটার উপর আমল করা হলো, তাহলে তার জন্য আমলকারীর সমান গোনাহ লেখা হবে, অথচ আমলকারীর গোনাহ সামান্যতমও কম করা হবে না।[৫৩]

[৫২] সহীহ মুসলিম: ৫২৩, তিরমিযী: ১৫৫৩, সহীহ ইবনে হিব্বান ৬৪০৩।

[৫৩] মুসলিম: ১০১৭, সুনানে দারেমী: ৫২৯, সহিহ ইবনে খুযায়মা ২৪৭৭ ।

সুন্নাহ এর বিপরীত হলো বিদআত

বিদআত শব্দটি আরবি البدع [আল-বিদআ'] শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিদআত শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন আবিষ্কার। শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত হচ্ছে– দ্বীনের নামে নতুন কাজ, নতুন ইবাদাত আবিষ্কার করা। নবী ﷺ বলেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতি। আর নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে ভ্রষ্টতা।[৫৪]

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার দলভুক্ত নয়।[৫৫] অর্থাৎ যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নতুন নতুন ইবাদাত আবিষ্কার করবে অথবা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করবে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতিকে তুচ্ছ মনে করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে?

বিদআতের কারণে জাহান্নাম অবধারিত:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّا

সব বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে জাহান্নাম।[৫৬]

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদআত

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুফতি আলী হুসাইন তার বইয়ে উল্লেখ করেন: শরীয়তের বিধান মনে করে সওয়াবের আশায় নিম্নলিখিত কাজসমূহ করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত–

- প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা। মীলাদ পড়া।
- রাসূল ﷺ-কে উপস্থিত মনে করে মীলাদে কিয়াম করা। এটি একটি বড় শিরকও বটে।
- ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদি সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা।
- যে দু'আ করার সময় হাত উত্তোলনের প্রমাণ নেই তাতে হাত উত্তোলন করা।
- কেউ মারা গেলে তার চল্লিশা বা দশা করা এবং যিয়াফত করা।
- ইসালে সওয়াবের জন্য হাফেয ডেকে কুরআন খতম করা।
- ইসালে সওয়াব ও কবর যিয়ারত করে প্রতিদান গ্রহণ করা।
- প্রচলিত খতমে খাজেগান করা।
- প্রচলিত খতমে ইউনুস ও বুখারী খতমের অনুষ্ঠান গুরুত্বের সাথে পালন করা।

---

[৫৪] সহীহ মুসলিম: ৮৬৭, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪৫ সহীহ ইবনে হিব্বান ১০।
[৫৫] সহীহ বুখারী: ৫০৬৩, সহীহ মুসলিম: ১৪০১, সুনানে নাসাঈ ৩২১৭।
[৫৬] সুনানে নাসাঈ: ১৫৭৮, সহীহ ইবনে খুযায়মা: ১৭৮৫।

- জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।
- পীর-দরবেশদের মাযারে মান্নত করা। বরং এটি একটি বড় শিরকও বটে।
- কবরে বাতি জ্বালানো, ফুল দেয়া, চাদর দ্বারা ঢেকে রাখা ও চুম্বন করা।
- কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা ও সিজদা করা। এটাও শিরক।
- কবরকে কেন্দ্র করে ওরশ করা।
- কবর পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা।
- কবরে আযান দেয়া।
- দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে সুরে সুর মিলিয়ে যিকির করা।
- ঈদের নামায ও খুতবার পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা।
- জুমার সুন্নত নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা।
- তারাবীহ এর প্রত্যেক ৪ রাকাতে অথবা সর্বশেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা।
- রমাযানের শেষ জুমাকে "জুমাতুল বিদা" বলে আখ্যায়িত করে মহল্লার মসজিদ ছেড়ে সেদিন শহরের বড় মসজিদে নামায আদায় করা।
- জানাযার নামাযের পর আবার সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা।
- জানাযার পর মুর্দার মুখ খুলে দেখানো।
- জানাযার পরে ও পূর্বে লোকটির ভাল হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করা।
- মুর্দাকে কবরে নেওয়ার সময় উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা।
- শবে বরাতে নফল নামায আদায় করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়া।
- শবে কদর বা শবে বরাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নফল নামায পড়তে হবে বলে ধারণা করা এবং সে নামাযে নির্দিষ্ট সূরা পাঠ করতে হবে বলে ধারণা করা।
- শবে বরাতে হালুয়া-রুটি পাকানো ও বণ্টন করা।
- পীরকে সর্বজ্ঞ ধারণা করা ও তার ধ্যানে মগ্ন হওয়া। এগুলো বর্তমানে শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।
- নবজাতককে বরকতের জন্য পীরের কবর বা মসজিদ স্পর্শ করানো।
- খৎনার অনুষ্ঠান করা।
- পীরদের কবর প্রদক্ষিণ করা।[৫৭]

ঈমান

ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ, মালাইকা/ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ عليهم السلام, আখিরাত বা পরকাল, তাকদীর বা ভাগ্য এ ছয়টি মৌলিক বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। তাসদীক বিল যিনান বা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইকরার বিল লিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমাল বিল আরকান বা বাস্তবে আমলে পরিণত করাই হচ্ছে ঈমানের দাবি।

---

[৫৭] **হাকীকতে সুন্নত বিদআত ও রসুমাত** মুফতী আলী হুসাইন হাফি.– পৃ: ১৮৩-১৮৪ (ঈষৎ পরিমার্জিত)। বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ রইল। - সংকলক।

ঈমানের রুকন কয়টি ও কী কী?

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ৬টি। যথা :

১) এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ তাঁকেই ইলাহ/উপাস্য হিসেবে মেনে নেওয়া।
২) মালাইকাদের/ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।
৩) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।
৪) নবী-রাসূলগণের ﷵ প্রতি ঈমান আনা।
৫) আখিরাতের/পরকালের প্রতি ঈমান আনা।
৬) তাকদীরের/ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

রাসূল তার রব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করিনা এবং তারা আরো বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম; হে আমাদের রব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন। [সূরা বাকারা ২: ২৮৫]

এছাড়াও রাসূল ﷺ-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

اَلْاِيْمَانِ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

ঈমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[৫৮]

ঈমানের রুকনসমূহ

আমাদের নিঃশ্বাস, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের শক্তি এবং আমাদের প্রেরণা সব কিছুর মূলে যে জিনিসগুলো অবস্থান করছে সেগুলো মাত্র ছয়টি। এ ছয়টি জিনিসের উপরই মানবজাতির ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের চূড়ান্ত মুক্তি নির্ভর করছে। এগুলোকে বলা হয় **"আরকানুল ঈমান" বা ঈমানের স্তম্ভ**। এর মাধ্যমেই মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য রচিত হয়। সুতরাং ঈমানের দাবিদার ব্যক্তির প্রত্যেককেই এগুলো খুব ভাল করে জানতে হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা :

ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমানের মূল কথা হলো, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই।

---

[৫৮] আবু দাউদ: ৪৬৯, ইবনে মাজাহ: ৬৩।

তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও আইন-বিধানদাতা। কিন্তু বর্তমান সময়ের অধিকাংশ মুসলিম আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করলেও আল্লাহকে আইন-বিধানদাতা এবং একক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের বিশ্বাসের ফলে তাওহীদি আকীদা-বিশ্বাসের সাথে শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের মিশ্রণ হয়ে যায় বিধায় উল্লেখিত শিরক মিশ্রিত ঈমান বা বিশ্বাস কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আরবের কাফের-মুশরিকরাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত; কিন্তু তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা আইন-বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করত না। ইসলাম আমাদের শেখায়, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এ বিশ্বলোকের রাজত্ব এবং পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি অগণিত সুন্দর নাম ও গুণাবলির অধিকারী। আর এসব গুণাবলিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

বলো, তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

[সূরা ইখলাস ১১২: ১-৪]

২. মালাইকাদের/ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা :

মালাইকাদের প্রতি ঈমানের মূল কথা হলো, মালাইকাগণ আল্লাহর সৃষ্টি। তারা নূরের তৈরি। মানুষের মতো তাদের কোন প্রকার জৈবিক চাহিদা নেই। তারা আল্লাহর পক্ষ হতে সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা সদা-সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ পাঠে মগ্ন থাকে এবং আল্লাহর হুকুম পালনে নিজেদের সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখাই হলো তাদের মূল কাজ। কোন অবস্থায়ই তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। মালাইকারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। তাদের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই ভাল মন্তব্য করতে হবে। তাই বলে আমরা তাদেরকে মাবুদ বা উপাস্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি না বা তাদেরকে আল্লাহর পুত্র কিংবা কন্যা সাব্যস্ত করতে পারি না; যেমনটি অনেক অমুসলিম ধারণা করে থাকে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ - لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ - وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيْٓ إِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ﴾

তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন, বরং তিনি এসব থেকে মহা পবিত্র; তারা হলো তাঁর বান্দা যাদেরকে সম্মানে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি কথা বলার আগেই

তারা[৫৯] (অর্থাৎ সম্মানিত বান্দারা) কথা বলে না, তারা তাঁর নির্দেশেই কাজ করে। তাদের সামনে আর পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না। তারা[৬০] তাঁর ভয় ও সম্মানে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে যে, তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ, তাহলে আমি তাকে তার প্রতিফল দেব জাহান্নাম। যালিমদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি। [সূরা আম্বিয়া ২১: ২৬-২৯]

৩. আসমানি কিতাবমূহের উপর ঈমান আনা:

আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى যুগে যুগে রাসূলগণের নিকট কিতাব নাযিল করেছেন যেন তারা তার (কিতাবের) মাধ্যমে মানুষদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে পারেন এবং তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে সতর্ক করতে পারেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ এর সহীফা সমূহ, মূসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ তাওরাত, দাউদ عَلَيْهِ السَّلَامُ এর নিকট নাযিলকৃত গ্রন্থ যাবূর, ঈসা এর নিকট নাযিলকৃত গ্রন্থ ইঞ্জীল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআন। ইয়াহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত এবং খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয়গ্রন্থ ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কুরআন যেহেতু সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানি গ্রন্থ, তাই আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى তাকে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এই কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে সত্যায়ন করে এবং সেগুলোর সংরক্ষক। অতএব পূর্বের আসমানি কিতাবে যে বিষয়ই উল্লেখ করা হোক না কেন তা যদি কুরআনের বিপরীত হয় তবে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে সেটা বিকৃত এবং পরিবর্তনের স্বীকার। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ইরশাদ করেন–

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

আর আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক। [সূরা মায়েদা ৫: ৪৮] আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন এবং সব ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

আমিই যিকির[৬১] (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক। [সূরা হিজর ১৫: ৯]

৪. নবী-রাসূলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَامُ প্রতি ঈমান আনা:

আমরা বিশ্বাস করি, মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য এবং তাদের নিকট রিসালাতের বাণী পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى মানুষের মধ্য থেকে কতিপয় নবী ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَامُ নির্বাচিত করেছেন। আবার নবীদেরও عَلَيْهِمُ السَّلَامُ মধ্য

---

[৫৯] বনূ খুযা'আ দাবি করত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। এ ভুল ধারণা দূর করতে আল্লাহ বলেন, ***ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান নয়; বরং তারা*** (আল্লাহর) ***সম্মানিত বান্দা***। - আল-কাশ্‌শাফ

[৬০] মালাইকারা/ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে।

[৬১] الذكر [আয-যিকর] দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে ।

থেকে নির্বাচিত করেছেন সম্মানিত রাসূলগণকে। আর রাসূলগণের নিকট শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন যেন তারা মানুষের নিকট তা পৌঁছে দেন এবং তাদেরকে দেন সঠিক পথের সন্ধান। সেসকল রাসূলের মধ্যে অন্যতম হলেন, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাম)। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণকে ﷷ অস্বীকার করতে হবে। বরং পূর্ববতী সকল নবী-রাসূল ﷷ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের ঈমানের মৌলিক দাবি। আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নবী ও রাসূল ﷷ এর নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের সকলের প্রতি এবং তাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি সমানভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে আমরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

﴿قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾

তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব হতে যা প্রদত্ত হয়েছিল, তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। [সূরা বাকারা ২: ১৩৬]

৫. আখিরাতের/পরকালের প্রতি ঈমান আনা:

আমরা বিশ্বাস করি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ ﷻ যে সময়-সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা শেষ হয়ে গেলে শুরু হবে আরেক নতুন জীবন। আল্লাহ ﷻ একজন ফেরেশতাকে সিংগায় ফুঁক দেয়ার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি তাতে ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ মারা যাবে। আবার তিনি তাতে ফুঁক দিবেন। এই ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে সব মানুষ কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। যারা দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করেছিল এবং আমলে সালেহ করেছিল তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দান করবেন। সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে মহা আনন্দ ও অনাবিল সুখ-সাচ্ছন্দে জীবনযাপন করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ﷻ-কে বিশ্বাস করেনি, নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেনি আল্লাহ ﷻ প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে নিদারুণ কষ্ট ও অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ - وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا - فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ - وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ - فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾

অতঃপর (দুনিয়ায়) যে লোক সীমালঙ্ঘন করেছিল, আর পার্থিব জীবনকে (পরকালের উপর) প্রাধান্য দিয়েছিল। জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল। আর যে লোক তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং নিজেকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। [সূরা নাযিআত ৭৯: ৩৭-৪১]

৬. তাকদীরের/ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা:

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর জ্ঞান এত সর্বময় ও ব্যাপক যে, তা কোন স্থান বা কালের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে নিরুপণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর রাজ্যের ভেতর তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। তাঁর শক্তি, জ্ঞান এবং নির্দেশ সকল কালে ও সকল যুগে সমানভাবে পরিবেষ্টিত। আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি তিনি পরম দয়ালু। প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও হিকমাহ সহকারে যথোপযুক্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়টি আমাদের মনে ও মগজে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলে আল্লাহর যাবতীয় কাজ পরিপূর্ণ ঈমান সহকারে অবশ্যই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। যদিও আমরা তার মূল রহস্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না অথবা ধারণা করি যে, এটি আমাদের স্বার্থের অনুকূলে নয়।

ঈমানের বিপরীত হলো কুফরী

কুফরীর সংজ্ঞা :

কুফরীর আভিধানিক অর্থ আবৃত করা ও গোপন করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের বিপরীত অবস্থানকে কুফরী বলা হয়। কেননা কুফরী হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান না রাখা, চাই তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক কিংবা না হোক। বরং তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ, উপেক্ষা কিংবা ঈর্ষা, অহংকার কিংবা রাসূলের অনুসরণের প্রতিবন্ধক কোন প্রবৃত্তির অনুসরণ কুফরীর হুকুমে কোন পরিবর্তন আনয়ন করবে না। যদিও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বড় কাফের হিসেবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে ঐ অস্বীকারকারী ও বড় কাফের, যে অন্তরে রাসূলগণের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও হিংসাবশতঃ মিথ্যা সাব্যস্ত করে থাকে।[৬২]

কুফরীর প্রকারভেদ : কুফরী দুই প্রকার:

- **প্রথম প্রকার :** বড় কুফরী । **দ্বিতীয় প্রকার:** ছোট কুফরী।

বড় কুফরী মুসলিম ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। এটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১. মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾

[৬২] মাজমুল ফাতাওয়াঃ ৩৩৫ ।

তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে আর প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা তাঁর নিকট থেকে আসে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নামের ভিতরে নয়? [সূরা আনকাবুতঃ ২৯:৬৮]

মনে বিশ্বাস রেখেও অস্বীকারবশত/অহংকারবশত কুফরী:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

এবং যখন আমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সিজদা করেছিল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [সূরা বাকারা ২: ৩৪]

২. সংশয়জনিত কুফরী:

একে ধারণাজনিত কুফরীও বলা হয়। এর দলীল আল্লাহর বাণী:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا - وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا - قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا - لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে; আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই তাহলে আমি তো নিশ্চয় এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানব আকৃতির? কিন্তু আমি বলি, আল্লাহই আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রবের সাথে শরীক করি না। [সূরা কাহফ ১৮:৩৫-৩৮]

৩. উপেক্ষা প্রদর্শন ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কুফরী:

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আহক্বাফ ৪৬:৩]

৪. নিফাকী ও কপটতার কুফরী:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। [সূরা মুনাফিকূন ৬৩: ৩]

- **দ্বিতীয় প্রকার: ছোট কুফরী :** এ প্রকারের কুফরী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত করে না। একে "আমলী কুফরী"ও বলা হয়। ছোট কুফরী দ্বারা সেসব

গোনাহের কাজকেই বুঝানো হয়েছে- কুরআন ও সুন্নাহ যেসব কাজকে কুফরী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কুফরী বড় কুফরীর সমপর্যায়ের। যেমন আল্লাহর নিয়ামতের কুফরী করা যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ﴾

আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে সেখানে আসত জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহর নিয়ামতরাজির কুফরী করল, অতঃপর আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির মুসীবত তাদেরকে আস্বাদন করালেন। [সূরা নাহল ১৬: ১১২]

এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ ধরনের কুফরীর অন্তর্গত। রাসূল ﷺ বলেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।[৬৩]

তিনি আরো বলেন: لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا, يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

আমার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেওনা, যাতে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দেবে।[৬৪]

গাইরুল্লাহর[৬৫] নামে কসমও এ কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ﷺ বলেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করল। সে কুফরী কিংবা শিরক করল।[৬৬]

কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ মুমিন হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى﴾

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হলো। [সূরা বাকারা ২: ১৭৮]

আল্লাহ বলেন: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ করে দেয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। [সূরা বাকারা ২:১৭৮]

---

[৬৩] সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৯, সহীহ বুখারী: ৪৮, ৭০৭৬, সহীহ মুসলিম: ২৮, ৪৬।

[৬৪] সহীহ বুখারী: ১২১, ৪৪০৩ সহীহ মুসলিম: ৬৫, ৬৬।

[৬৫] আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি বা শক্তির ইবাদাত/উপাসনা-আনুগত্য অথবা বিধান মানা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে– তাকে গাইরুল্লাহ বলে।

[৬৬] মুসনাদে আহমাদ ৬০৭২, ৫৫৯৪ আবু দাউদ: ৩২৫১, সুনানে তিরমিযী: ১৫৩৫ ।

এখানে হত্যাকারীকে ঈমানদারদের দল থেকে বের করে দেয়া হয়নি। বরং তাকে কিসাস গ্রহণকারীর ভাই হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ভাই দ্বারা এখানে দ্বীনী ভাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا﴾

মুমিনদের দু'দল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। [সূরা হুজুরাতঃ ৪৯: ৯] এর পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। [সূরা হুজুরাতঃ ৪৯ :১০]

সার কথা হলো:

- বড় কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং আমলসমূহ নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে না এবং আমলও নষ্ট করে না। তবে তা তদানুযায়ী আমলে ত্রুটি সৃষ্টি করে এবং লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তির মুখোমুখি করে।
- বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। কিন্তু ছোট কুফরীর কাজে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে না। বরং কখনো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। ফলে সে মোটেই (আর) জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।
- বড় কুফরীতে লিপ্ত হলে ব্যক্তির জান-মাল মুসলিমদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। অথচ ছোট কুফরীতে লিপ্ত হলে জান-মাল বৈধ হয়না।

বড় কুফরীর ফলে মুমিন ও অত্র কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। তাই সে ব্যক্তি যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন, তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা মুমিনদের জন্য কখনই বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে কোন বাধা নেই। বরং তার মধ্যে যতটুকু ঈমান রয়েছে সে পরিমাণ তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং যতটুকু নাফরমানী তার মধ্যে আছে, তার প্রতি ততটুকু পরিমাণ ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করা যেতে পারে।[৬৭]

---

[৬৭] মূল: সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান । অনুবাদ : মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী। (সংক্ষেপিত-ঈষৎ পরিমার্জিত]

Contents

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

ওযু করার পর এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো সম্পাদিত হলে ওযু ভেঙ্গে যায়। নামায-রোযা ও অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও একই কথা। তেমনি এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো ঈমান আনার পর করলে, ঈমান ভেঙ্গে যায়। ঈমান ভঙ্গ হলে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে মুসলিম কাফের[৬৮] এ পরিণত হয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলো– আমরা ওযু ভঙ্গের কারণ জানি, সালাত (নামায) ভঙ্গের কারণ জানি, কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ আমরা অনেকেই জানি না। এমন অনেক মুসলিম রয়েছে যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ঈমান ভঙ্গের কারণ কী কী? তাহলে সে বলতে পারবে না। অথচ ঈমান আনার পূর্বেই এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

আসুন জেনে নিই **ঈমান ভঙ্গকারী ১০টি** বিষয়।

১. আলস্নাহর সাথে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা:

আল্লাহর সাথে শরীক বিভিন্নভাবে হতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

• আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করা।

নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

﴿فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ﴾

কাজেই তুমি অন্য কোন ইলাহকে আল্লাহর সঙ্গে ডেকো না। অন্যথায় তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [সূরা শুআরা ২৬: ২১৩]

উল্লেখিত আয়াতে নবী ﷺ-কে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে। অথচ নবীদের জাহান্নামী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যারা পীর, ওলী-আওলিয়া বা কোন কবরবাসীকে ডাকে, তাদের ইবাদাত করে,

---

[৬৮] **কাফের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলি: ১. জ্ঞান থাকা:** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হচ্ছে সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন ও হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং ঐ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি ঐ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরী কাজের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত পন্থায় সংশয়মুক্ত জ্ঞান দান করতে হবে। **২. স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা:** যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন ও হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অপরাধে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যদি অনিচ্ছায়/অজ্ঞানবশত বা ভুলক্রমে অপরাধে জড়িত হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। **আরও দুটি মূলনীতি: প্রথম মুলনীতিঃ** দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কারও নিকট যদি এ জ্ঞান এসে থাকে যে, বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে, এমতাবস্থায়ও যদি ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ না করে (বর্জন করে) তবে সে কাফির। কারণ ইসলাম অর্থই হলো, আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে (নির্দেশ বা নিষেধ) আসবে তার সব কিছুকেই গ্রহণ করা। **দ্বিতীয় মূলনীতিঃ** কিন্তু যে দ্বীনের বিষয়টিকে গ্রহণ করল অতঃপর এর আদেশ-নিষেধ এর কোন কোনটির লঙ্ঘন করল এবং স্বীকার করল যে, সে অন্যায় করেছে, সে কাফির নয়। সে গুনাহগার হলো, খালিস অন্তরে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন ইনশা-আল্লাহ। এ দুটি মুলনীতির দৃষ্টিতে কেউ যদি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একটিমাত্র নির্দেশ কিংবা একটিমাত্র নিষেধকে জেনে-বুঝে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার বা বর্জন/ঘৃণা করে সে কাফির।

তারা ঈমান হারাবে এবং জাহান্নামী হবে যদি না তারা তাওবা করে মৃত্যুবরণ করে। কারণ এটা স্পষ্ট শিরক। আর এ ধরনের শিরক মুমিনকে ঈমানহীন করে দেয়।

● মৃতব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া বা অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করা শিরকে আকবার তথা বড় শিরক। কোন মুমিন যদি এ কাজ করে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভাল-মন্দ দেওয়া, না দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ ﷻ। তিনি বলেন,

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

বলো, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি এমন কিছুর ইবাদাত করছ যাদের না আছে কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা, আর না আছে উপকার করার। আর আল্লাহ; তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা মায়েদা ৫: ৭৬]

আল্লাহর নবী ﷺ নিজেই নিজের উপকার-অপকার করতে পারতেন না বলে কুরআনে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে রাসূল ﷺ নিজেই নিজের উপকার-অপকার করতে পারেন না সেখানে অন্যদের মাধ্যমে কি করে উপকার আশা করা যায়?

আল্লাহ ﷻ তার নবীকে বলেন, ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

বলো, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। [সূরা আরাফ ৭: ১৮৮]

২. আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে উকিল, সুপারিশকারী বা ভায়া-মাধ্যম তৈরি করা: শাফাআতের মালিক একমাত্র আল্লাহ ﷻ। তিনি বলেন,

﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

বলো, শাফাআত সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। [সূরা যুমার ৩৯: ৪৪]

এক শ্রেণির লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাত করে এবং তাদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ তাদের সুপারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। বলো, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন, না আকাশমন্ডলীতে আর না জমিনে? মহান পবিত্র তিনি, তোমরা যা কিছুকে তাঁর সাথে শরীক গণ্য কর তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। [সূরা ইউনুস ১০: ১৮]

৩. কাফেরদেরকে কাফের মনে না করা:

কাফেরদেরকে কাফের মনে না করা বা তাদের প্রকাশ্য কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদসমূহ সঠিক মনে করা ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বড় হজ্জের দিনে[৬৯] মানুষদের কাছে ঘোষণা দেয়া হলো যে- আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রাসূলও। [সূরা তওবা ৯: ৩]

অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর কোন দায়দায়িত্ব নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾

কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা আর মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই সৃষ্টির অধম। [সূরা বায়্যিনাহ ৯৮: ৬]

যার কারণেই আল্লাহ কাফের-মুশরিকদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾

মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মূলত মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম ওদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিও না, বস্তুত মুশরিককে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, মুমিন গোলাম তার চেয়ে উত্তম। ওরা অগ্নির দিকে আহ্বান করে; আর আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। [সূরা বাকারা ২: ২২১]

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উত্তম বিধানদাতা মনে করা:

যদি কোন মুসলিম নবী করীম ﷺ এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ অথবা ইসলামী হুকুমাত ব্যতীত অন্য কারো তৈরি হুকুমাত উত্তম মনে করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, মানুষের তৈরি আইন ও বিধান ইসলামী শরীয়ত থেকে উত্তম বা ইসলামের সমান, মানবসৃষ্ট বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা জায়েয, ইসলামী হুকুমাত বিংশ শতাব্দির জন্য প্রযোজ্য নয়; এগুলো মধ্যযুগীয়, ইসলামই মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ, ইসলামের সাথে পরকালীন সম্পর্ক, দুনিয়াবি কোন সম্পর্ক নেই ইত্যাদি– উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এসব কথাবার্তা কুফরীর শামিল। কারণ এটা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার হীন প্রচেষ্টা মাত্র।[৭০]

---

[৬৯] অর্থাৎ যিলহজ্জের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন।

[৭০] ফাতাওয়া আল-মারআতুল মুসলিমা, ১/১৩৭।

৫. আল্লাহর **কোন বিধান অপছন্দ/ঘৃণা করাঃ**

যদি কোন মুসলিম আল্লাহর নবী ﷺ এর আনীত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ/ঘৃণা করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুর্ভোগ আর তিনি তাদের কর্মকে বিনষ্ট করে দেবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ৮-৯]

﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ﴾

আগেও তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছে আর তোমার অনেক কাজ নষ্ট করেছে যতক্ষণ না প্রকৃত সত্য এসে হাজির হলো আর আল্লাহর বিধান প্রকাশিত হয়ে গেল। যদিও এতে তারা ছিল নাখোশ। [সূরা তওবা ৯: ৪৮]

৬. দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাঃ

যদি কোন মুসলিম মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত দ্বীনের কোন বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ أَبِاللهِ وَاٰيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ - لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾

তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম। বলো, আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ। [সূরা তওবা ৯: ৬৫-৬৬]

যারা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কোন আশা নেই। এ ধরনের লোকদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা ত্যাগ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত আচরণ পরিত্যাগ না করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا﴾

কিতাবে তোমাদের নিকট তিনি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফরী করা হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। [সূরা নিসা ৪: ১৪০]

৭. যাদু-মন্ত্র করা :

যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভাল কিছু অর্জন বা মন্দ কিছু বর্জন করতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা ভাঙ্গন ধরাতে গোপন, প্রকাশ্য, মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে (ছেলে-মেয়ে) সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে চায় তবে তা সম্পূর্ণরূপে কুফরী। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে উভয়ই কুফরী করল। আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কী? তিনি বললেন (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।[৩]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদুকে কুফরী ও শয়তানি শিক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, ﴿وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। [সূরা বাকারা ২: ১০২]

অত্র আয়াতের শেষের দিকে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না । [সূরা বাকারা ২: ১০২]

৮. **মুসলিমদের** বিরুদ্ধে (কাফের-মুশরিকদের) **অমুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করা:**

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এমন কাজ করে তবে সে কুফরী করল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয় সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। [সূরা মায়েদা ৫: ৫১]

---

[৩] বুখারী: ২৭৬৬, মুসলিম: ৮৯, সুনানে আবু দাউদ ২৮৭৪,সুনানে নাসাই ৩৬৭১।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾

হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। [সূরা মুমতাহিনা ৬০: ১]

৯. ইসলাম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নাজাত পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা:

যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন/জীবনব্যবস্থা/ধর্ম বা অন্য কোন পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে, কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আল ইমরান ৩: ৮৫]

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। [সূরা নিসা ৪: ১১৫]

মানুষ আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে অন্য দ্বীন তালাশ করে, অথচ আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর দ্বীন মেনে চলছে। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾

এরা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের সন্ধান করছে? অথচ আসমান ও জমিনে যা আছে সবই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। [সূরা আল-ইমরান ৩: ৮৩]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জড় বস্তু আল্লাহর দ্বীনের অনুগত হতে বাধ্য, আর মানুষের বিষয়টি তো এর চেয়ে কঠিন। কারণ মানুষ আল্লাহর দ্বীন মানবে বলে রূহের জগতে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে এসেছে। যা লঙ্ঘন করলে জাহান্নামী হতে হবে।

১০. আল্লাহর **মনোনীত দ্বীন–ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া:**

যারা ইসলাম অনুসারে আমল করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ/অখুশি বা ইসলাম মেনে চলবে না বা ইসলামকে ঘৃণা করবে, এরকম ব্যক্তি কাফের। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। [সূরা সাজদা ৩২: ২২]

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ - قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا - قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ﴾

আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ; আর তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

[সূরা ত-হা ২০: ১২৪-১২৬]

মানুষ নির্দ্বিধায় আল্লাহকে ভুলে অসৎ পথে চলে, পাপাচারে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির অনুসারী হতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু হক যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করত তবে আসমান-জমিন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾

সত্য যদি তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খার অনুসারী হতো তাহলে আকাশ, পৃথিবী আর এ দু'য়ের মাঝে যা আছে সব লন্ডভন্ড হয়ে যেত। (তাদের কামনা-বাসনার) বিপরীতে আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের জন্য উপদেশবাণী কিন্তু তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। [সূরা মুমিনূন ২৩: ৭১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আকীদাহ ও তাওহীদ গ্রহণের পর যদি কেউ উল্লিখিত বিষয়গুলিতে নিপতিত হয়, তবে সে ঈমান হারা হয়ে যাবে। তাকে তাওবা করে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। তাওবার ডাক দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

বলো- হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। [সূরা যুমার ৩৯: ৫৩]

কবীরা গুনাহ কাকে বলে?

কবীরা গুনাহ বলা হয় ঐ সকল পাপ কর্মকে, যেগুলোতে নিম্নোক্ত কোন একটি বিষয় পাওয়া যাবে:

- যেসকল গুনাহের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
- যেসকল গুনাহের ব্যাপারে দুনিয়াতে নির্ধারিত দন্ড প্রয়োগের কথা রয়েছে।
- যেসকল কাজে আল্লাহ ﷻ রাগ করেন।
- যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে এমনটি করবে সে মুসলিমদের দলভুক্ত নয়।
- কিংবা যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
- যে কাজে দ্বীন নেই, ঈমান নেই ইত্যাদি বলা হয়েছে।
- যে ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটি মুনাফিকের আলামত বা মুনাফিকের কাজ। অথবা যে কাজকে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা

মহান আল্লাহ বলেন

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব। [সূরা নিসা ৪: ৩১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত/নামায, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান এতদুভয়ের মাঝে সংঘটিত সমস্ত পাপরাশির জন্য কাফফারা স্বরূপ হয়ে যায়, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।[৭২]

কুসংস্কার

যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা বা গোঁড়ামির অপর নাম কুসংস্কার। আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের বহু কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। যা প্রতিনিয়ত মানুষ কথায় ও কাজে ব্যবহার করে থাকে। শুধু পশ্চাদপদ জনতাই নয়, দেশের সর্বস্তরেই এ কুসংস্কার আসন গেড়ে আছে। কিছু কিছু কুসংস্কার সাধারণ বিবেক বিরোধী এবং রীতিমত হাস্যকরও বটে। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি। মূলত বাজারে **'কী করলে কী হয়?'** এই টাইপের কিছু **চটি বই** হলো এসবের আমদানিকারক। মূর্খ কিছু মানুষ অন্ধবিশ্বাসে এগুলোকে লালন করে। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি।

---

[৭২] সহীহ মুসলিম: ২৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭০০ ৯১৯৭।

নাজাতপ্রাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলের রাস্তা (পথ নির্দেশিকা)

জয়যুক্ত বা নাজাতপ্রাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) দল বলতে বুঝায় যে দলটি হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং জান্নাতে যাবে যার সম্পর্কে নবী ﷺ হাদিসে বলে গেছেন। আমরা এখানে সে দলের গুণ/বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট দলীল দ্বারা আলোকপাত করব ইনশা-আল্লাহ।

১। আল্লাহ ﷻ বলেন : আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো ও বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩]

২। অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন : যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে- প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উল্লসিত। [সূরা রূম, ৩০: ৩২]

৩। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার, শোনা ও মান্য করার, যদিও তোমাদের আমীর হয় কোন হাবশি দাস। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা নানা মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের করণীয় হবে, আমার সুন্নত এবং হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের[৭৩] সুন্নতকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া। সেসব সুন্নতকে মজবুতভাবে, চোয়ালের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার ন্যায় আঁকড়ে ধরবে। দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন আমল সংযোজনের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকবে; নিশ্চয় সমস্ত নতুন আমলই বিদআত এবং সমস্ত বিদআতই গোমরাহী এবং সমস্ত গোমরাহী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৭৪]

৪। নবী করিম ﷺ আরও বলেছেন, ওহে! তোমাদের পূর্বে আগত আহলে কিতাব (ইয়াহুদি ও নাসারা/খ্রিস্টান)-রা ৭২ ফিরক্বা/দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। ৭২ ফিরক্বা/দল যাবে জাহান্নামে এবং একটি মাত্র ফিরক্বা/দল প্রবেশ করবে জান্নাতে। তারাই হলো আল-জামাআহ।[৭৫] যখন ঐ জাহান্নামী ফিরক্বা/দলগুলোর দাওয়াত ব্যাপক হবে, তখন আল-জামাআহকে আঁকড়ে থাকা সম্পর্কে হুযায়ফা رضي الله عنه-কে নবী ﷺ বলেছেন, তুমি মুসলিমদের "আল-জামাআহ" ও তাদের ইমামকে শক্তভাবে ধরে রাখবে (অর্থাৎ আল-জামাআহ এর সুস্পষ্ট পরিচয় হলো জামাআতুল মুসলিমীন বা মুসলিমদের জামাআহ[৭৬])। হুযায়ফা رضي الله عنه বললেন, সে সময় যদি কোন মুসলিম জামাআহ বা তাদের ইমাম না থাকে (তখন আমাকে কি করতে হবে)? তিনি বললেন, তখন তুমি বিচ্ছিন্ন দলের সবগুলোকেই পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকর চিবিয়ে জীবনধারণ

---

[৭৩] অর্থাৎ চার খলিফা। আবু বকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه, ওসমান رضي الله عنه ও আলী رضي الله عنه।

[৭৪] আবু দাউদ : ৪৬০৭ সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫ সুনানে নাসাঈ ১৫৭৮।

[৭৫] সুনানে আবু দাউদ ৪৫৯৭, সুনানে দারেমী ২৫৬০।

[৭৬] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ رضي الله عنه বলেন, জামাআহ বলা হয় যা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও তুমি হক্বের অনুসারী একাই হও। -[বায়হাকি ফিল মাদখাল, গৃহিত শায়খ আব্দুল আজীজ আল রশিদ, আত্তানবিহাত আসসানিয়াহ] কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বর্গই আল-জামাআহ। চাই তিনি একক ব্যক্তি হন বা তাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠি হন।

করতে হয় এবং তুমি এ অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল ফিরক্বা সমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে এতে যে কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হতে পারে)।[৭৭]

অন্য হাদীসে নবী করিম ﷺ বলেন, আমি এবং আমার সাহাবীদের মতের (পথের) অনুসারী দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে।[৭৮]

৫। ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিতঃ (তিনি বলেন) আমাদের জন্য নবী করিম ﷺ একটি দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এটা আল্লাহর সোজা (সঠিক) রাস্তা। তারপর তার ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এ রাস্তাগুলোর সবকটিতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। এরপর তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন: "আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"- [সূরা আনআম ৬: ১৩৫]।[৭৯]

৬. নাজাতপ্রাপ্ত দল/মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলতে সে দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূল ﷺ এর জীবিত থাকা কালে তাঁর রাস্তাকে/মতকে/পথকে আঁকড়ে ধরেছেন দৃঢ়ভাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে গেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় (জিনিস) রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন), আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ (আদর্শ)।[৮০]

৭. সে দলের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নিজেদের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সাথে সাথে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের দিকে প্রত্যার্পণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা। [সূরা নিসা, ৪ : ৫৯]

৮. এ দল আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর কথার উপর কারও কথাকে প্রাধান্য দেয় না। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, ওহে মুমিনগণ! তোমরা (কোন বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১]

---

[৭৭] সহীহ বুখারি ৩৬০৬, ৭০৮৪ সহীহ মুসলিম ১৮৪৭।

[৭৮] সুনানে তিরমিযী ২৬৪১ (হাসান)।

[৭৯] সুনানে কুবরা নাসাঈ ১১১০৯, সহীহ ইবনে হিব্বান : ৬, মুসনাদে আহমাদ ৪১৪২।

[৮০] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ৩, ৩৩৩৮, ১৮৭৪, মিশকাত ১৮৬, সিলসিলা সহীহাহ ১৭৬১।

৯. নাজাতপ্রাপ্ত দলের আরো একটি পরিচয় হলো, সর্বক্ষেত্রে তারা তাওহিদকে অগ্রাধিকার দেয়। তাদের সব কথা ও কাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের বিকাশ ঘটে, কেবল তাঁরই ইবাদাত করে, তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে তাঁকেই ডাকে, তাঁর নামেই যবেহ করে, নযর দেয়/মান্নত করে এবং তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে। ইবাদাত-বন্দেগী, বিচার-আচার, লেন-দেন এক কথায় জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ প্রবর্তিত শরীয়ত অনুযায়ী সম্পাদন করে।

১০. এ দল ইবাদাত, চরিত্র গঠন ও যাবতীয় কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সুন্নতকে জীবিত করে। ফলে নিজেদের সমাজে তারা (স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের নান্দনিকতায়) অপরিচিত-অচেনার মতো হয়ে যায় এবং এরা সংখ্যায় খুবই কম। এদের সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত এর মতো এবং আবার ফিরে আসবে অপরিচিত এর মতো যেমন শুরুতে ছিল। সেই (গুরাবা) অপরিচিতদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।[৮১]

১১. এ দল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর কথার বাইরে অন্য কারও অন্ধ অনুসরণ করে না। আর তারা চার মাযহাবের সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামগণকে সম্মান করে এবং তাদের সকলের কথা/মত হতেই মাস'আলা গ্রহণ করে যদি সেই কথা/মত আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এর সাথে মিলে যায়। যার মত অধিক বিশুদ্ধ তার কথা/মত গ্রহণ করে এবং তাদের অন্ধ-অনুসরণ করে না। যেহেতু রাসূল ﷺ ছিলেন নির্দোষ (গোনাহ থেকে পবিত্র), তিনি মনগড়া কোন কথা বলেননি। তিনি ছাড়া অন্যান্য মানুষ যতই বড় হোন না কেন ভুল করতে পারেন। কেউই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। এ প্রসঙ্গে নবী করিম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান প্রত্যেকেই ভুলকারী। ভুলকারীদের উত্তম ঐ ব্যক্তি যারা তওবা করে (এবং ভ্রান্ত পথ হতে ফিরে আসে।)[৮২]

১২. নাজাতপ্রাপ্তদলের একটি বিশেষ অংশ হলো, আত-ত্বয়েফাতুল মানসুরা[৮৩]।

আত-ত্বয়েফা অর্থ-দল। ছোট দলও হতে পারে বা বড় দলও হতে পারে। আল-মানসুরা অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত। যারা সবসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত বা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আত-ত্বয়েফাতুল মানসুরা (সাহায্যপ্রাপ্ত-দল) যারা, মুসলিমদেরকে আল্লাহর রাস্তায়/পথে জিহাদের প্রতি আহ্বান করে। তারা যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ/লড়াই করে। যাদের সম্বন্ধে রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা অবধি যারা তাদের অপমান করবে- তারা তাদের (উক্ত দলের) কোন ক্ষতি করতে

---

[৮১] সহীহ মুসলিম ১৪৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৮৬।

[৮২] সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫১, সুনানে দারেমী ২৭৬৯।

[৮৩] যারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক চলবে তারাই আল-ফিরকাতুন নাযিআহ বা নাজাতপ্রাপ্ত দল। তারা যুদ্ধ করুক বা না করুক। আর ত্বয়েফাতুল মানসুরা বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল হচ্ছে এই নাজাত প্রাপ্তদলের একটি বিশেষ অংশ যারা জিহাদ/যুদ্ধ করবে। আল-ফিরকাতুন নাযিআহ বা নাজাতপ্রাপ্ত দল আম (ব্যাপক) ত্বয়েফাতুল মানসুরা বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল একটি খাস (বিশেষ) দল। আত-ত্বয়েফাতুল মানসুরা বলতে আল-মুজাহিদুন ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত সেনাদল)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ এই হাদীসের অনেকগুলি বর্ণনাতে يُقَاتِلُوْنَ 'ইয়ূক্বতিলুনা' অর্থাৎ তারা যুদ্ধ করবে শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।

পারবে না।[৮৪] ইমরান বিন হুসাইন ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হক এর উপর যুদ্ধ করবে। তাদের বিরোধীদের উপর তারাই বিজয়ী থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।[৮৫]

জিহাদ সামর্থ অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। সহীহ বুখারীর আরবি ভাষ্যকার ইমাম কাসত্বালানি জিহাদের সংজ্ঞায় বলেন- ইসলামের সাহায্যার্থে ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।[৮৬] প্রকৃত পক্ষে জিহাদ বলতে সাহাবায়ে কেরাম কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কালিমা/দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং কাফেরদের আক্রমণ থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধকেই বুঝতেন। সাধারণত জিহাদ শুরু হবে নিচের ধাপ অনুযায়ী:-

প্রথমত: জিহ্বা ও লেখনীর মাধ্যমে। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সত্যিকারের ইসলাম আঁকড়ে ধরার দাওয়াত দিতে হবে। আরো দাওয়াত দিতে হবে শিরকমুক্ত তাওহীদ লালন করার প্রতি। আর এ দিকটির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কারণ শিরক আজ বেশির ভাগ মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মহামারির মতো। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেনঃ

কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু কবিলা মুশরিকদের সাথে মিলে যায় এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু কবিলা (পাথরের) মূর্তি পূজা করে।[৮৭]

দ্বিতীয়ত: সম্পদের মাধ্যমে। যেমন- ইসলাম প্রচার ও দাওয়াত কাজে সম্পদ ব্যয় করা। এ সংক্রান্ত বইপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করা। দুর্বল ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করে তুলতে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন কল্পে ব্যয় করা। অস্ত্র তৈরি ও কেনার জন্য মাল খরচ করা এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন প্রয়োজনে তা দান করা। রাসূল ﷺ বলেছেন: তোমরা নিজ সম্পদ, জীবন ও জিহ্বার মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।[৮৮]

তৃতীয়ত: জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যেমন- আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম/প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা। যাতে আল্লাহর কালিমা উঁচু হয় এবং কাফিরদের কালিমা নিচু হয়। মুসলিমদের ভূমি ও নিজেদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্যও যুদ্ধ করা। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! আমি কি

---

[৮৪] সহিহ মুসলিম: ১৯২০, সুনানে ইবনে মাজাহ ১০।

[৮৫] আবুদাউদ: ২৪৮৪, মিশকাত: ৩৮১৯।

[৮৬] ইরদাসুল বারী ৫/৩১, ফাতহুল মুলহীম ৩/২।

[৮৭] সুনানে আবু দাউদ ৪২৫২, মুসনাদে আহমাদ ২২৪৫৩।

[৮৮] মুসনাদে আহমাদ ১২২৪৬, সুনানে আবু দাউদ ২৫০৪।

তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো; এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে! (তোমরা যদি আল্লাহর সন্ধান দেয়ার ব্যবসা কর তাহলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটাই বিরাট সাফল্য। [সূরা সাফ ৬১: ১০-১২]

জিহাদের প্রকার ও তার বিধান:

১। ফরযে আইন:

কাফিররা কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকল মুসলিমের উপর সমানভাবে ফরযে আইন হয়ে পড়ে।

যেমন- ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মায়ানমার, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি। ফিলিস্তিন আজ ইয়াহুদি সন্ত্রাসীরা জোর করে দখল করে নিয়েছে। সন্ত্রাসীদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে মুসলিমদের প্রথম কিবলা মাসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার জন্য জান-মাল দিয়ে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সামর্থবান সকল মুসলিমের উপর ফরযে আইন। এ দায়িত্বে কেউ অবহেলা করলে অথবা পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করলে জিহাদ শুরু করা পর্যন্ত সকলে পাপী বলে সাব্যস্ত হবে। অথচ বর্তমান মুসলিমরা জিহাদ ভুলে গেছে। তাই মুসলিম যুবকদেরকে জিহাদি চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে আবার ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

২। ফরযে কিফায়া :

প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম এ জিহাদের জন্য তৈরি হয়ে গেলে বাকিরা দায়মুক্তি পেয়ে যাবে। তবে পৃথিবীর সকল মানুষ যাতে ইসলামি বিধান মেনে চলতে শুরু করে সে লক্ষ্যে ইসলামের দাওয়াত দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ কাজে কেউ বাধা দিলে দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্ন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

১৩. নাজাত প্রাপ্ত/মুক্তিপ্রাপ্ত দল ইসলাম ও শরীয়ত পরিপন্থী মানবরচিত আইন ও বিচারের বিরোধিতা করে। বরং এরা মানব জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিতাব অনুযায়ী বিচার কায়েম করার প্রতি আহ্বান করে। আর এতেই রয়েছে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। কারণ এটি মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান। তিনিই জানেন কীসে তাদের কল্যাণ আর কীসে অকল্যাণ। তাছাড়া এ কিতাব অপরিবর্তনীয়- সময়ের বিবর্তনের সাথে কখনই এর পরিবর্তন হবে না। এটি সর্ব কালের সর্ব-শ্রেণির লোকদের জন্য প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বমানবতা বিশেষ করে

মুসলিমদের দুর্ভোগ ও পেরেশানির অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত অসার সংবিধানে বিচারকার্য পরিচালনা করছে। জীবনাচারে কুরআন ও সুন্নাহর অনুবর্তন অনুপস্থিত। তাদের অপমান-অপদস্থ হবার এটিই মূল কারণ। এ অবস্থার পরিবর্তন কখনই হবে না যদি না তারা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার দিকে ফিরে আসে। ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্টিগতভাবে। সামাজিকভাবে হোক কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে।[৮৯]

অতএব উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের দলীল থেকে নাজাতপ্রাপ্ত/মুক্তিপ্রাপ্ত দলের যে বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম তার সারমর্ম/মূলকথা হলো:

- তারা আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হবে। তারা সর্বাগ্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার চার খলিফার আদর্শের/মতের/পথের অনুসারী।
- তারা চার মাযহাবের ইমাম ও অন্যান্য শ্রদ্ধেয় ইমামদের সম্মান করবে, **তারা সালাফে সালেহীনদের**[৯০] ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিবে এবং তাদের বিশুদ্ধ/সঠিক মতটি/কথাটি গ্রহণ করবে যা কুরআন ও সুন্নাহ এর সাথে সদৃশ/মিলে যায়। তারা কোন বিষয়ে মতবিরোধ/মতানৈক্য দেখা দিলে কুরআন-সুন্নাহ এর কাছে ফিরে যাবে চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য।
- তারা মানুষকে সর্বাগ্রে তাওহীদের দাওয়াত দিবে এবং তাওহীদকে প্রাধান্য দিবে। তারা সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইবাদাত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনে সবচেয়ে বেশি ওহীর বিধানকে প্রাধান্য দিবে। তাগূতী বিধানকে বর্জন করবে।
- তারা সমস্ত বিদআতকে পরিহার করে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে জামাআতবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তারা দলে দলে বিভক্ত হবে না বরং জামাআতবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যদিও তাদের সংখ্যা খুব কম/নগণ্য হয়। তারা সমাজের মধ্যে গুরাবা/অপরিচিত/অচেনা বা আগন্তুকের মতো থাকবে।
- নাজাতপ্রাপ্ত/মুক্তিপ্রাপ্ত দলের একটি বিশেষ দল আত ত্বয়েফাতুল মানসুরা বা সাহায্যপ্রাপ্তদল যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ/যুদ্ধ করবে এবং মুসলিমদেরকে আল্লাহর রাস্তায়/পথে জিহাদের দিকে আহ্বান করবে ।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের লোকদের বিশেষ/গুণ বা কোন নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে বরং হাদীসে উল্লেখিত যেসব বৈশিষ্ট্য/গুণাবলি তাদের আছে সেগুলি নিজের জীবনে আমলে/কাজে পরিণত করতে পারলেই মুক্তিপ্রাপ্ত/সঠিক দলের অন্তর্ভুক্ত/অনুসারী হওয়া যাবে। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন॥

---

[৮৯] মূল: **মুক্তিপ্রাপ্তদলের পথ নির্দেশিকা- শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামিল জাইনূ** তা:পা: পৃ: ৬-১২। (সংক্ষেপিত,সংযোজিত ও ঈষৎ পরিমার্জিত)

[৯০] সাহাবীদের সময় থেকে শুরু করে তাবে-তাবেঈন পর্যন্ত যারা ছিল। (৩ মুসলিম জেনারেশন) যারা এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তাদেরকে বা তাদের ঐ সময়কালকে সালাফে সালেহীন বলে।

কবরে যে প্রশ্ন করা হবে!

এখানে আমি যা বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা মুমিন, কাফির, পরহেজগার, ফাসিকসহ সকল প্রাপ্তবয়স্ক বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর এটাই সকল শব্দ ও দীর্ঘ হাদীস যা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি। **কবরে মুমিন বান্দাকে যে প্রশ্ন করা হবে:**

হুংকারকারী শক্তিশালী দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে প্রশ্ন করবে: তোমার রব কে? সে বলবে: আমার রব আল্লাহ। তারা বলবে: তোমার দ্বীন কী? সে বলবে: আমার দ্বীন ইসলাম। তারা বলবে: তোমাদের নিকট প্রেরিত এই লোকটি কে? সে বলবে: তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তারা বলবে: তুমি কীভাবে জানলে? সে বলবে: আল্লাহর কিতাব পড়েছি, এর ওপর ঈমান এনেছি এবং বিশ্বাস করেছি। তাকে ধরে জিজ্ঞেস করে বলবে: তোমার প্রভু কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? আর এটিই হবে মুমিন আত্মার ওপর অর্পিত শেষ ফিতনা। সে বলবে: আমার রব আল্লাহ, দ্বীন ইসলাম এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তখন আকাশ হতে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন জান্নাত থেকে সুগন্ধির হাওয়া আসতে থাকবে এবং তার জন্য তার কবরকে চোখের শেষ দৃষ্টি পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন: তার নিকট সুশ্রী সুন্দর পোশাক পরিহিত একজন ফেরেশতা আসবে, অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তার বেশ ধরে এসে বলবে: তোমাকে আনন্দিত করবে এমন একটি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসীম শান্তি বিশিষ্ট জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

অপরদিকে কাফির, মুশরিক-ফাসিক/মুনাফিক বান্দাকে কবরে যে প্রশ্ন করা হবে:

তার নিকট গম্ভীর দু'জন ফেরেশতা এসে ধমকাবে এবং তাকে বসিয়ে বলবে: তোমার রব কে? সে বলবে: হায়! হায়! আমি জানি না। তারা বলবে: তোমার দ্বীন কী? সে বলবে হায়! হায়! আমি জানি না। তারা বলবে: সেই লোকটি কে যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল? তখন সে তাঁর নাম স্মরণ করতে পারবে না। বলা হবে (তাঁর নাম কি) মুহাম্মাদ? সে বলবে: হায়! হায়! আমি জানি না; কিন্তু লোকজনকে এ নাম বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: তাকে বলা হবে, তুমি জাননি এবং যারা জেনেছে তাদের অনুসরণও করনি। তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন: সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও; যেন সেখান থেকে উত্তাপ ও প্রখর বাষ্প আসতে থাকে। অতঃপর তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তার বুকের হাড়গুলো একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যাবে। তারপর বিশ্রী মুখ বিশিষ্ট জীর্ণ কাপড় পরিহিত দুর্গন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি তার নিকট আসবে- অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তার বেশ ধরে বলবে, তুমি এমন একটি সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমার অনিষ্ট করবে। আজ সেই দিন যে দিনের অঙ্গীকার

তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। সে বলবে: তুমি কে? তোমাকে আল্লাহ এমন দুঃসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন? তোমার চেহারা তো সেই চেহারা যা অনিষ্ট বয়ে আনে। সে বলবে: আমি তোমার মন্দ আমল। আল্লাহর কসম! তুমি তাঁর আনুগত্যের প্রতি ছিলে অত্যন্ত নিশ্চল এবং তাঁর নাফরমানীর প্রতি ছিলে চতুর। সুতরাং আল্লাহ তোমার মন্দের যথাযথ প্রতিদান দিয়েছেন। [মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৩৪, মিশকাত: ১৬৩০, সনদ হাসান]

সুতরাং এ হাদীস থেকে জানা গেল, যারা দ্বীনি ইলম/জ্ঞান অর্জন করবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ/হাদীস পড়বে এবং তা অনুযায়ী আমল করবে তারাই কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আর যারা শুনে শুনে অন্ধভাবে লোকে যা বলত তাই মানত, তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

উদাত্ত আহ্বান!

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো না।

হে ভাই ও বোনেরা ! কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে **কালিমাতুশ শাহাদাহ** ও **কালিমাতুত তাওহীদ** এর সঠিক অর্থ, ব্যাখ্যা, উপকারিতা, ফযীলত, গুরুত্ব, তাওহীদ, তাগূত, শিরক, সুন্নাহ, বিদআত এবং ঈমান ভঙ্গের কারণ, কবীরা গুনাহ, স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হলো। সম্মানিত দ্বীনি ভাই ও বোন! এ সমস্ত বিষয় থেকে সতর্ক হোন এবং স্মরণ করুন সেই দিনের কথা, যে দিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই থেকে, মাতা-পিতা থেকে, পত্নী ও সন্তানদের থেকে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এতটাই চিন্তিত থাকবে যে, সবচেয়ে আপনজনের কথাও কারো স্মরণে থাকবে না। সতর্ক হোন সে দিনের জন্য যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন উপকারে আসবে না। সেদিন উপকারে আসবে কেবল তাওহীদি ঈমান ও সুন্নাহসম্মত আমল। সুতরাং ফিরে আসুন হকের পথে। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। আহ্বান করুন অপরকে। দাওয়াত দিন পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের। অটল থাকুন, ধৈর্য ধরুন। আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

হে আমার ভাই ও বোন.....আজ থেকেই না হয় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এই বইটি প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে যেন সকল নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয় তাওহীদ তথা **লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ** এর দাওয়াত খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন ।

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষি থেকো আমি সত্য পৌঁছেয়েছি।

বইটি পড়া হলে অন্যকে উপহার দিন অথবা এমন স্থানে রাখুন যাতে বইটি যে কেউ পড়তে পারে ও উপকৃত হতে পারে।

বইটি সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য

আল্লাহু আকবার!!! আমার যদি সামর্থ থাকত তবে **১৬ কোটি মানুষের** কাছে এই বইটি পৌঁছে দিতাম। যারা বইটি পড়েননি, তারা অবশ্যই পড়ে নিবেন। **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর বেসিক বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

-শরিফ আল হুসাইন

ঢাকা। আল্লাহু

দাওয়াতি কাজের জন্য এই বইটা না পড়লে চরম মিস করবেন! এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বই এটি। কালিমা, তাওহীদ, তাগূত, শিরক, বিদআতসহ অনেক বিষয় খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে লেখক এ বইটিতে সংকলন করেছেন। আল্লাহ ﷻ লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন। আমীন।

–ইবনে আহমাদ

দুবাই, ইউনাইটেড আরব আমিরাত।

কালিমাতুশ শাহাদাহ বইটি আমার মনে হয় প্রত্যেক নর-নারীর পড়া উচিত। এই বইয়ে বিশেষ করে কালিমার বর্জনীয় বিষয়গুলো নিয়ে লেখক যেভাবে সুশৃঙ্খল আলোচনা করেছেন তা আমি এখন পর্যন্ত অন্য কোন বাংলা বইয়ে পাইনি। ইসলামকে বুঝতে হলে, ইসলামের মূল ফিগারকে চিনতে হলে– যেভাবে চিনেছিলেন যমিনের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী– সাহাবায়ে কেরামগণ, তবে এই বইটি একবার পড়ে দেখুন। দেখুন তারা শত বিপত্তি সত্ত্বেও কোন্ কালিমার বলে পৃথিবীতে এক অনন্য রাজত্বের নমুনা তৈরি করে গেছেন– যার অংশবিশেষ অনুসরণ করেও উন্নত রাষ্ট্রগুলো আরও উন্নত হচ্ছে। আসুন আরেকটিবার সেই কালিমার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিই– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই।

–রওশন কবির

ঢাকা।

......জাহেলিয়াতের সাথে নিজেকে এতটাই জড়িয়ে ফেলেছিলাম যে, শুধুমাত্র নামেই মুসলিম ছিলাম। বইটিতে কালিমা, তাওহীদ, শিরক নিয়ে এমন সব লেখা আছে, যা আমার ঈমানি চেতনা বাড়িয়ে দিয়েছে। বইটি যদিও ছোট্ট তবুও এতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আগে আমার জানা ছিল না। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব নিজের ঈমানের অবস্থান জানতে বইটি নিজে পড়ুন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীদের পড়তে উৎসাহিত করুন।

–হাসান ইমাম

দুবাই, ইউনাইটেড আরব আমিরাত।

আলহামদুলিল্লাহ। বইটি পড়ে আমি ইসলামের বেসিক বিষয়গুলো জানতে পারলাম। বইটি যদিও ছোট্ট, কিন্তু এতে অনেক ব্যাপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কালিমা, তাওহীদ, তাগূত এবং শিরক সম্পর্কে এমন কিছু লেখা বইটিতে আছে যা আগে আমি কখনও জানতাম না। কাজেই সবাইকে বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

–ওয়াহিদুর রহমান

রাজশাহী।

......কালিমাকে জেনে-বুঝে আমল করা অত্যন্ত জরুরি। আর এই জরুরি বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ জানতে এই বইটি আমার কাছে খুব সুন্দর মনে হয়েছে। তাওহীদ ও এর বিপরীত শিরক, বিদআতসহ অনেক বিষয় এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তাই জ্ঞানপিপাসুদের আমার পক্ষ থেকে বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

–জামির হুসাইন জামির

সিঙ্গাপুর।

.....এক কথায় বইটি অসাধারণ! ভাই এত পরিশ্রম করে সুন্দর একটা বই উপহার দিয়েছেন, মহান আল্লাহ ভাইকে সীমাহীন বারাকাহ দান করুন। আর সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মহান রাব্বুল আলামীন বারাকাহ দান করুক।

–সাইফ হাসান সাঈদ

ঢাকা